পাক্ষিক আহ্‌মদী

2002

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ☐ ২৪তম সংখ্যা

৩০ জুন, ২০০২ ইসাব্দ

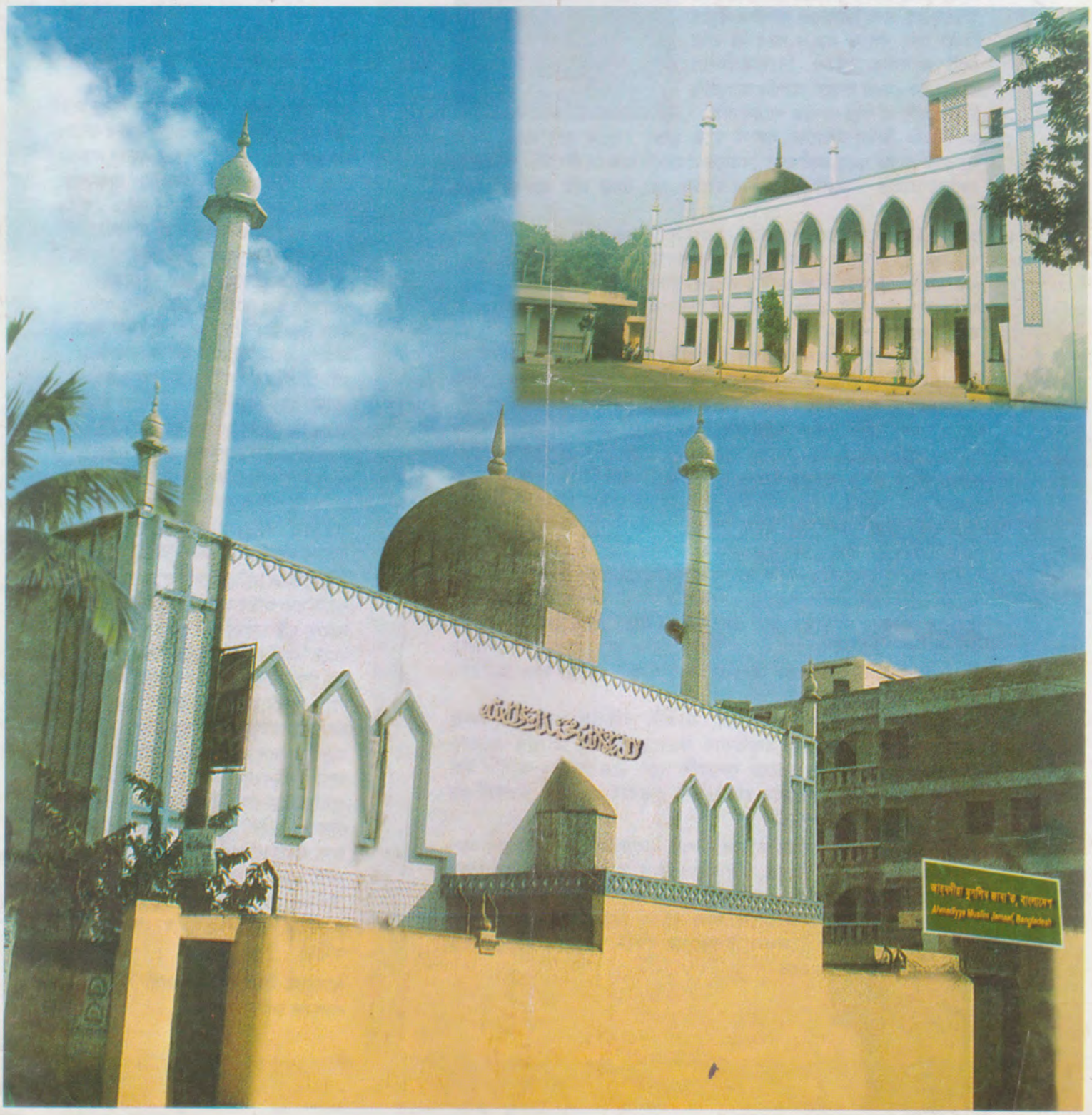

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে. অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

"কু আনফুসিকুম ওয়া আহলিকুম নারান"

ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম। এর মধ্যে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সমাজের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং একের সাথে অপরের দায়-দায়িত্ব বহনের মাধ্যমে সংশোধনের প্রক্রিয়াকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালনের নির্দেশ করা হয়েছে। এসব দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র তথা বিশ্ব-সমাজে সৃষ্টি হতে পারে জান্নাতের পরিবেশ।

উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার সাথে তার সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সকলের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার দায়-দায়িত্বও অর্পণ করেছেন। পরিবারের কর্তার ওপরে যেমন তার পরিবারের সকলের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যার দায়িত্ব অর্পণ করেছে ইসলাম তেমনি সমাজের বিভিন্ন স্তরে যারা কর্তার স্থান দখল করে আছেন তাদের ওপরেও তাদের অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে অনুরূপ দায়-দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এখানে শুধু আত্মীয়তার বন্ধনকেই কেবল মাপকাঠি হিসেবে দৃষ্টিতে রাখা হয় নি বরং কর্তব্যের বাঁধনকেও একটি মাপকাঠি হিসেবে দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে। হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন- তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই রাজাস্বরূপ এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থ প্রজা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ মূল্যবান বক্তব্যের প্রেক্ষিতে পরিবারের কর্তা ব্যক্তি যেমন দায়িত্বপ্রাপ্ত তেমনি সমাজের বিভিন্ন স্তরে যারা নিযুক্ত তারাও তাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ দিক থেকে যুগ-খলীফা যেমন তার অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত তেমনি স্তরে স্তরে যত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা রয়েছেন তারাও সকলেই দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাদের অধীনস্থদের প্রসঙ্গে একদিন সকলেই আল্লাহ্ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হবেন।

তাই ন্যাশনাল আমীর হিসেবে জামাতের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আমার অধীনস্থ রয়েছেন তাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই- আপনারা সকলে নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হোন এবং নিজ নিজ অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোন। একদিন আমাদের সকলকেই আমাদের মহান প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্তাআলার সমীপে দাঁড়াতে হবে জবাবদেহীর জন্যে। সেদিন যেন আমরা লজ্জিত না হই। আমাদের মনে রাখা উচিত আমাদের অধীনস্থ লোকদের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষের জন্যে আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এর কতটুকু আমরা পালন করেছি সে ব্যাপারে যেন সঠিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হতে পারি। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলের সহায় হোন, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ॥ ২৪তম সংখ্যা

১৬ আষাঢ় ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ১৮ রবিউস সানী ১৪২৩ হিঃ কাঃ
৩০ ইহসান ১৩৮১ হিঃ শাঃ ৩০ জুন ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	-	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

আজকের দিনের ভাবনা

আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যখন কোন নবী-রসূল বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ আবির্ভূত হন আল্লাহ্‌তাআলা তখন তাঁর মাধ্যমে এক নতুন আকাশ নতুন পৃথিবী তথা এক নব কৃষ্টি ও সভ্যতার জন্ম দিয়ে থাকেন। এ কৃষ্টি ও সভ্যতাকে নির্মল-নিষ্কলুষ ও অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে, তাঁর মাধ্যমে প্রদর্শিত আদর্শকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী সমাজকে কতিপয় নিয়ম-নীতি কঠোরতার সাথে পালন করতে হয়। নবীর আদর্শ ও কৃষ্টি-সভ্যতাকে অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে বিয়ে-সাদীর ব্যাপারটি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিয়ে-সাদীর ব্যাপারে তাই আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিন সমাজকে কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যেমন বলেছেন, "তোমরা মুশরিক নারীদেরকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিয়ে করো না, আর একজন মু'মিন দাসী একজন মুশরিক নারী অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করুক না কেন। আর মুশরিক পুরুষরা যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে তাদের সাথে (মু'মিন নারীগণের) বিয়ে দিও না। এবং একজন মু'মিন দাস একজন মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করুক না কেন। এরা তোমাদেরকে আগুনের দিকে ডাকে আর আল্লাহ্ নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে (তোমাদেরকে) জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্যে নির্দেশনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে" (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ২২২)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে কয়েকটি বিষয় আমাদের নিকট সুস্পষ্ট ঃ ১। নর ও নারী নির্বিশেষে সর্বাবস্থায় ঈমানদারকে বিয়ে করবে, ২। মুশরিক নর ও নারীর চেয়ে মু'মিন দাস-দাসী উত্তম, ৩। পুরুষদের বিয়ে করতে আর নারীদেরকে বিয়ে দিতে বলা হয়েছে অর্থাৎ নারী স্বেচ্ছায় একা একা বিয়ে করতে পারে না।

উল্লেখ্য, সূরাতুল মায়েদার ৬ আয়াতে যদিও আহলে কিতাবের মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে কিন্তু শর্ত হলো তাকে সতী-সাধ্বী হতে হবে। ঈমান ব্যতিরেকে সতী-সাধ্বী হওয়ার প্রত্যাশা খুবই ক্ষীণ আর বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতিরেকে এ ব্যবস্থাকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং একজন মু'মিন নর বা নারী একজন মু'মিন নর বা নারীকে বিয়ে করবে এটাই কাম্য।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নির্দেশ দিয়েছেন, যেন কোন আহমদী ছেলে কোন আহমদী মেয়েকে বিয়ে না করে এবং কোন আহমদী মেয়েকে যেন অ-আহমদী ছেলের সাথে বিয়ে দেয়া না হয় [ফাতাওয়া, মসীহ্ মাওউদ (আঃ), পৃষ্ঠা ১৪৪]। জামাতের বিধানে বলা হয়েছে, বিশেষ ক্ষেত্রে এক আহমদী ছেলে যথাযথ নিয়মে ওকালতে তবশীরের অনুমতি নিয়ে এক অ-আহমদী মেয়েকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু কোন আহমদী মেয়েকে কোন অবস্থাতেই অ-আহমদী ছেলের সাথে বিয়ে দেয়া যাবে না।

সত্য বলতে কি প্রবল অবক্ষয়ের প্লাবনে আহমদীয়ত দ্বীপতুল্য আশ্রয়স্থল। বয়াতের পরে নেযামের আনুগত্যের শৃঙ্খলকে নিজেরাই যদি ভেঙ্গে ফেলি তাহলে আহমদীয়তের জন্যে এত কষ্ট ও ত্যাগ কি করে অর্থবহ হতে পারে? বিয়ে-সাদীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানকল্পে আমাদেরকে সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং এগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে সবার আগে।

প্রথমতঃ উপরোক্ত কুরআনী আয়াতের আলোকে প্রত্যেক আহমদী ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যদি গায়রত বা আত্মাভিমান সৃষ্টি করা হয় আর তারা ভাবে যে, আমরা অন্যদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং জীবনের মূল্যবোধ আলাদা। তাহলে কেউ জামাতের শৃঙ্খলার বেষ্টনী ভেঙ্গে জামাতের বাইরে বিয়ে করতেই পারে না। তাই ইসলাম ও আহমদীয়তের বৃহত্তর স্বার্থে গায়রত বা আত্মাভিমান ও রুচি বোধ সবার আগে সৃষ্টি করা দরকার। আর এর জন্যে পিতা-মাতাকে সচেষ্ট হতে হবে। ছোটবেলা থেকেই ঘরের মধ্যে এথেকে জাগরিত ও উচ্চকিত করতে হবে যে, একজন অ-আহমদীকে বিয়ে করা আত্মাভিমান ও রুচি বোধকে জলাঞ্জলি দেয়া আর এ রকম করা আত্মহননের শামিল। দ্বিতীয় বিষয় হলো, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দেয়ার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা। যেখানে সহ-শিক্ষা রয়েছে সেখানে একজন মেয়েকে উচ্চ শিক্ষা দিতে গেলে যেকোন সময় যে পদস্খলন হতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

(অবশিষ্টাংশ সূচীর নীচে দৃষ্টব্য)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ - ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
■ হাদীস শরীফ ঃ বয়স্কদের বেশি বেশি উত্তম কাজ করতে উৎসাহ দান	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
■ অমৃত বাণী ঃ সত্যিকারের ভালবাসা ও ঐশী সমর্থন হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের	৪
■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'আযীয' নামের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-১০
■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১১-১৩
■ পুস্তক পরিচিতি ঃ Revelation Rationality Knowledge & Truth	ঃ অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন	১৪
■ ইসলামের রণ নীতি	ঃ আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	১৫
■ রিয়া ও এথেকে পরিত্রাণ	ঃ অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ	১৬-১৮
■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৯
■ ছোটদের পাতা ঃ ফুলের তোড়া (গুলদাস্তা) (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক)	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২০-২১
■ নতুনদের পাতা		
● খান সাহেব মুন্সী অরোড়ে খান (রাঃ)	ঃ অনুবাদ- জনাব কওসার আলী মোল্লা	২২-২৩
● রসূল করীম (সঃ)-এর উপর দুরূদ পড়ার ফযিলত	ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন	২৪
● প্রসঙ্গ ঃ তাক্ওয়া	ঃ মৌঃ মোঃ আমীর হোসেন	২৪-২৫
● সামাজিক জীবনে ইসলাম	ঃ মৌঃ মোঃ মজিদুল ইসলাম	২৬-২৮

প্রচ্ছদ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কমপ্লেক্স ও দারুত তবলীগ মসজিদ

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

অবশ্য জামাতী উদ্দেশ্য কখনও মেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা নয়। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী তা করতে হবে। সহশিক্ষা থেকে নিষেধ করা হলে এক যুগপূর্ণ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-কে লিখেছিলেন, তাহলে কি আমরা মেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষা দেবো না? হুযূর (রাহেঃ) জবাবে বলেছিলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) কোন্ এম, এস, সি, থি। উল্লেখ্য, এ আয়েশার (রাঃ) কাছ থেকেই হুযূর (সঃ) ধর্মের অর্ধেক শিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল না হয় তাহলে মেয়েদেরকে ঘরে বসে পড়াতে হবে। এটাই তাকওয়ার চাহিদা। আর এতে যে সমস্যা নিয়ে আমরা কথা বলছি তার সম্ভাবনা অনেকটাই কম হবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয়তঃ প্রত্যেক স্থানীয় জামাতে **ইসলাহী কমিটি**-র কাজকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর করতে হবে। একটি মেয়ে বা ছেলে বা তাদের পরিবার একদিনেই তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে স্খলিত হয় না। সমাজের সকলের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রেম-প্রীতির যে বন্ধন তা যেন যে কোন মূল্যে অটুট রাখার চেষ্টা করা হয়। কোন ভাইয়ের বা তার পরিবারের মধ্যে বে-তরবিয়তি কোন কিছু লক্ষ্য করা গেলে তাদেরকে তা থেকে মুক্ত করার জন্যে জামাতের কর্মকর্তাদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। সাধারণতঃ কর্মকর্তাদের সাথে ব্যক্তিগত ব্যাপারে মনোমালিন্যও সদস্যদের দূরে সরে পড়ার একটি কারণ। তাই যে কোন মূল্যে কর্মকর্তাদের আচার-আচরণকে সুশীল করার চেষ্টা করতে হবে, ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে হলেও। আন্তরিকতা, ভালবাসা, হৃদ্যতা সর্বোপরি দোয়ার মাধ্যমে যদি চেষ্টা করা হয় তবে সফলতা সম্বন্ধে একশ' ভাগ নিশ্চিৎ হওয়া যেতে পারে। যারা কোন কারণে জামাত থেকে দূরে সরে গেছেন বা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন তাদের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রেখে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার সর্বপ্রকার চেষ্টাকে প্রাধান্য দিতে হবে। মনে রাখতে হবে তারা আমাদের ভাই। তাদেরকে ফিরিয়ে আনা আমাদের নৈতিক ও খোদা-প্রদত্ত দায়িত্ব। দুনিয়াতে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা কখনও বিফল হয় নি- একথাটা আমাদের মনে গেঁথে নিয়ে আজ এখনই আমাদের সকলকে ইসলাহী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আল্লাহ্ করুন আমরা ইসলাহের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন সফলতার বরমাল্য কুড়োতে সক্ষম হই।

-নির্বাহী সম্পাদক

কাদিয়ানের ১১১তম সালানা জলসা

■ সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কাদিয়ানের ১১১তম সালানা জলসা-২০০২ অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্যে ২৬-২৮ ডিসেম্বর, ২০০২ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার সদয় অনুমোদন দিয়েছেন।

জামাতের বন্ধুগণের নিকট আবেদন তারা যেন কাদিয়ানের সালানা জলসার সফলতার জন্যে দোয়া করেন এবং অধিক থেকে অধিক সংখ্যায় এ পবিত্র জলসায় যোগদানের প্রস্তুতি নেন।

কানাডা ও আমেরিকা জামাতের সালানা জলসার তারিখ

■ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা কর্তৃক প্রকাশিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এ বছর ৫-৭ জুলাই, ২০০২ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার কানাডা জামাতের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে।

■ তেমনিভাবে আমেরিকা জামাতের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে ২৮-৩০ জুন, ২০০২, রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার।

এসব জলসার সফলতার জন্যেও সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

(সূত্র ঃ সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান ২৯-৫-২০০২)

- নির্বাহী সম্পাদক

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আ'রাফ - ৭

رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

১২৩। যিনি মূসা ও হারূনের প্রভু-প্রতিপালক'।

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَاۤ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

১২৪। ফেরাউন বললো, 'আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় এটা একটা চক্রান্ত, যা তোমরা সবাই এ শহরে করেছ, যাতে তোমরা সেখান থেকে এর অধিবাসীদের[১০৩২] বের করে দিতে পার, অতএব তোমরা অচিরেই (এর পরিণাম) জানতে পারবে;

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۲۵﴾

১২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের হাত ও তোমাদের পা (অবাধ্যতার জন্য) বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব, অতঃপর তোমাদের সকলকে অবশ্যই ক্রুশ-বিদ্ধ করে হত্যা করবো।[১০৩৩]

قَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۲۶﴾

১২৬। তারা বললো '(তাহলে তো) আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই ফিরে যাব;

وَ مَا تَنْقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲۷﴾

১২৭। আর তুমি আমাদের ওপর শুধু এ জন্য প্রতিশোধ নিচ্ছ যে, আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর ওপর ঈমান এনেছি, যখন সেগুলি আমাদের নিকট এলো। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে পরম ধৈর্য দান কর ও আমাদেরকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও। *(১৪, রূকূ)*

وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَ قَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ اٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَ نَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَ اِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿۱۲۸﴾

১২৮। এবং ফেরাউনের জাতির নেতারা বললো, 'তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে ছেড়ে দিচ্ছো, যাতে তারা দেশে[১০৩৪] বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদেরকে[১০৩৫] বর্জন করে?' সে বললো, 'নিশ্চয় আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করে ছাড়বো[১০৩৬] ও তাদের নারীদের জীবিত রাখবো আর নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর প্রবল'।

১০৩২। "এর অধিবাসী" শব্দদ্বয় এখানে ফেরাউনের নিজ গোত্রকে বুঝাচ্ছে, যারা প্রকৃতপক্ষে মিশরের অধিবাসী ছিল না তারা স্থানীয় অধিবাসীদিগের দেশ জবর-দখল করেছিল।

১০৩৩। ক্রুশবিদ্ধ অর্থ-ক্রুশে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদন্ড। এক্ষেত্রে হাত ও পা কাটা যুক্ত করে নির্যাতনকে অধিক দৃষ্টান্তমূলক এবং মৃত্যুকে অধিকতর যন্ত্রণাদায়করূপে প্রকাশ করছে। প্রসঙ্গক্রমে, এই আয়াত প্রতিপন্ন করে, হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগেও ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদন্ড দেয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

১০৩৪। হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর ভাইকে (৭ঃ১১২) অবকাশ দেয়ার জন্য সর্দারগণ নিজেরাই ফেরাউনকে পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু পরে সেই প্রধানগণই মূসা ও হারূন (আঃ)-কে সময় দেয়ায় তাকে দোষারোপ করেছিল। এরূপে যারা নৈতিক অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয়, তারা মর্যাদাহীন এবং অপমানকর অবস্থা সম্মুখীন হয়ে থাকে।

১০৩৫। ফেরাউনের জাতির লোকেরা তাকেই খোদারূপে পূজা করত (২৮ঃ৩৯) এবং সে পালাক্রমে অন্যান্য প্রতিমা পূজা করত। এ কারণে সর্দারগণ ফেরাউন এবং তার খোদাগুলিকে প্রকাশ্যে অস্বীকার ও বর্জনের দোষে হযরত মূসা ও হারূন (আঃ)-কে অভিযুক্ত করেছিল।

১০৩৬। "নুকাত্তিল" (অর্থ-নির্মমভাবে বধ করব) শব্দ তীব্রতা বা প্রচন্ডতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে, একটু একটু করে নিষ্ঠুরভাবে বধ করা বুঝায়।

হাদীস শরীফ

বয়স্কদের বেশি বেশি উত্তম কাজ করতে উৎসাহ দান

কুরআন ঃ

وَ هُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿۳۸﴾

অর্থ ঃ আর তারা তাতে চিৎকার করবে ও বলবে 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে (এ জাহান্নাম থেকে) বের কর, আমরা সৎকাজ করবো, উহার পরিবর্তে যা আমরা করতাম,' (আল্লাহ্ বললেন,) 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন আয়ু দিই নি, যাতে উপদেশ গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করতে পারে? অথচ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিলো। অতএব (এখন) তোমরা এটা ভোগ কর কারণ, জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই (সূরাতুল ফাতির ঃ ৩৮)।

হাদীস ঃ

আন আবী হুরায়রাতা আনিন নাবীয়্যে (সঃ) ক্বালা আ'যারাল্লাহু ইলামরিঈন আখ্খারা আজালাহু হাত্তা বালাগা সিত্তিনা সানাতান (বুখারী)।

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ যে ব্যক্তিকে ষাট বছর দান করেছেন তার মৃত্যুর পর তার থেকে কোন ওজর কবুল করবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্তাআলা বলছেন, দীর্ঘায়ু দান এ জন্য যে, তোমরা যেন নসীহত অর্জন করো অর্থাৎ সৎকর্মশীল হও। মানুষের জন্য ইহকাল ক্ষণস্থায়ী ও পরকালটি হলো স্থায়ী। তাই এ জগতে মানুষকে সৎকর্ম করে পরকালের জীবন গড়তে হবে। খোদার দেয়া এ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মানুষ তা হেলায় নষ্ট করে। খোদাতাআলা তাঁর

সতর্ককারী দ্বারা মানুষকে বার বার স্মরণ করিয়েছেন যে, তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য খোদার বান্দা হওয়া। কামনা-বাসনার মায়াজাল হতে মুক্ত হয়ে খোদার সন্তুষ্টিতে জীবন যাপন করা। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, যে ষাট বছর জীবিত থাকে পরকালে তার কোন ওজর কবুল করা হবে না। অর্থাৎ ষাট বছর জীবিত থাকার পরও যদি কেউ জান্নাতী না হতে পারে তবে খোদাতাআলা তার কোন ওজর-আপত্তি কবুল করবেন না।

দীর্ঘজীবন মানুষকে পরিপক্ক করে তুলে। ভালো মন্দ চিনতে শেখায়। সুতরাং ষাট বছর জীবন পাবার পরও যদি কেউ মন্দকে পরিহার না করে ও খোদার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত না হয় তবে এটা তার জন্য দুর্ভাগ্য। ষাট বছর অর্থ হলো অবসর জীবন তখন তো খোদার দিকে ঝুঁকে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। কিন্তু আমাদের চতুর্দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, বয়স হলে যেন মানুষের দুষ্ট-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। দুনিয়ার মোহ যেন আরো ব্যাপকভাবে আঁকড়ে ধরে। তাই খোদা ও তাঁর রসূলের বাণী যেন আমাদের খোদার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে সর্বদা আমাদের লক্ষ্য যেন সেদিকেই থাকে, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

সত্যিকার ভালবাসা ও ঐশী সমর্থন

হযরত আকদস মসীহ্ (আঃ) বলেন ঃ

তোমাদের জন্য আবশ্যক যে, রাতের বেলা (নিদ্রা ত্যাগ করে) উঠে দোয়া করো এবং তাঁর আশিষ অন্বেষণ করো। প্রত্যেক নামাযে দোয়ার কয়েকটি সুযোগ আছে, রুকূ, কেয়াম, বৈঠক, সিজদাহ্ প্রভৃতিতে। আট প্রহরে (দিন রাতে) পাঁচ বেলা নামায পড়তে হয়- ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা। উপরন্তু এথেকে অতিরিক্ত ইশরাক আর তাহাজ্জুদ নামাযও রয়েছে। এসবগুলোই দোয়ার জন্য সুবর্ণ সুযোগ। নামাযের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দোয়া, আর খোদাতাআলার ঐশী নিয়ম মোতাবেক দোয়া করা। সাধারণভাবে দেখ যে, যখন শিশু কান্নাকাটি করে এবং কাতর হয়ে যায় তখন মা কীভাবে বিচলিত হয়ে তাঁকে দুধ পান করায়। তদ্রূপ খোদাও (তাঁর) বান্দার মাঝে অনুরূপ একটি সম্পর্ক আছে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি তা বুঝতে পারে না। যখন মানুষ খোদাতাআলার দরজায় ধর্ণা দিয়ে একান্ত মিনতি, বিনয় আর নম্রতার সাথে ঝুঁকে নিজ অবস্থাকে উপস্থাপন করতঃ তাঁর নিকট সকল প্রয়োজনে প্রার্থনা করে তখন তাঁর প্রতিপালন গুণের মাঝে আবেগ সৃষ্টি হয় আর তার প্রতি করুণা করা হয়। খোদাতাআলার আশিস ও করুণার দুধও এক ক্রন্দনের প্রত্যাশী। এ জন্য তাঁর দরবারে ক্রন্দনকারী চোখ উপস্থাপন করা আবশ্যক। যে বলে খোদাতাআলার দরবারে কান্না-কাটি করলে কিছুই পাওয়া যায় না-এ ধারণা ত্রুটিযুক্ত এবং মিথ্যা। এ ধরনের লোক আল্লাহ্তাআলার অস্তিত্ব, শক্তি ও মাহাত্ম্য ও গুণাবলীর ওপর ঈমান রাখে না। যদি তারা প্রকৃতই ঈমান সৃষ্টি করতো তাহলে ওরূপ কথা কখনই বলতো না। যখন কেউ খোদার দরবারে উপস্থিত হয় আর সে সত্যিকার তওবার সাথে তাঁর দিকে ঝুঁকে তখন আল্লাহ্তাআলা তার উপর নিজের আশিস বর্ষণ করে থাকেন। এটা পুরোপুরি সত্য কথা যেমন কোন একজন বলেছেন ঃ

আশেক কেহ্ শুদ কে ইয়ার বেহালাশা নযর নাহ্ করদ।
আয়ে খাজা দরদ নীস্ত ওয়া গারনাহ্ ত্বাবীব হাস্ত॥

আল্লাহ্তাআলা তে চান যে, তোমরা তাঁর দরবারে পবিত্র হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হও, শর্ত কেবলমাত্র এতটুকুই যে, তাঁর জন্য নিজেকে উপযুক্ত বানাও ও (নিজ জীবনে) সত্যিকার পরিবর্তন সৃষ্টি করো। খোদার সত্তার আশ্চর্য ধরনের গুণাবলী রয়েছে, এবং তাঁর অশেষ আশিস ও কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু ওগুলো দেখার ও লাভ করার জন্য ভালবাসার চোখ সৃষ্টি করো। যদি সত্যিকার ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পার তাহলে দেখবে খোদাতাআলা অনেক দোয়া শুনে থাকেন আর সমর্থনও প্রদান করেন। কিন্তু শর্ত এই যে, খোদার প্রতি যেন ভালবাসা আর নিষ্ঠা থাকে। ভালবাসা এমনই এক বিষয় যে, তা মানুষের নীচ ও তুচ্ছ জীবনকে জ্বালিয়ে এক নূতন আর পরিচ্ছন্ন মানুষ বানিয়ে দেয়। তখন সে তা-ই দেখতে পায় যা পূর্বে পেতো না। আর সে তা-ই শুনতে পায় যা সে পূর্বে শুনতে পেতো না (আল্ হাকাম, নবম খন্ড, ১১ নম্বর ৩১শে মার্চ, ১৯০৫ইং)।

অনুবাদ- আহমদ তারেক মুবাশ্বের
মোয়াল্লেম

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

আল্লাহ্‌তাআলার 'আযীয' নামের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) খুতবা দেন।

আজকের খুতবায় খোদাতাআলার সিফত 'আযীয' সম্পর্কে বর্ণনা আরম্ভ হবে। সারাংশ আকারে আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে, কুরআন শরীফে ৮৮ বার 'আযীয' সিফতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৭ বার 'আযীয' এর সাথে 'হাকীম' সিফতকে রাখা হয়েছে। বাকী আয়াতগুলোতে 'আযীয' এর সাথে 'যুনতিকাম' 'কাভীউন', 'আলীম', 'হামিদ', 'রহীম', 'গফুর', 'ওহ্হাব', 'গফফার', মুকতাদির' এবং 'জাব্বার' সিফতকে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে, সূরা শোয়ারা'র ১১টি রুকূর মধ্যে ৮টি রুকূই 'আযীযুর রহীম' দিয়ে শেষ হয়েছে। এবার আমি সংক্ষেপে 'আযীয' শব্দের অর্থ বলছি।

ইমাম রাগিব তাঁর মুফরাদাতে লিখেছেন, 'আযীয' এমন ব্যক্তি বা সত্তাকে বলা হয়, "যিনি সকলের উপরে বিজয়ী, যার উপর কেউ কখনও কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।" আযীয-এর মধ্যে বিজয়ী হবার সাথে সাথে সম্মানীত হওয়ার অর্থও নিহিত। এসব বিজয় যার মধ্যে শান-শওকত, ইয্যত, মান-মর্যাদা সমানভাবে বিদ্যমান। আয়াতঃ **ইন্নাহু লাকিতাবুন আযীয-** অর্থ ঃ এমন গ্রন্থ যার সাথে প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব, যার তুল্য গ্রন্থ রচনা অসম্ভব।

লেসানুল আরব- এ আছে ঃ 'আযীয' ঃ আল্লাহ্‌র সিফত এবং তাঁর পবিত্র নামগুলোর মধ্যে একটি নাম। যুজ্‌জাজ বলেছেন, 'আযীয' অপরাজিতকে বলা হয়, যাঁর উপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না। অনেকের মতে 'আযীয' শক্তিশালী এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী সত্তাকে বলা হয়। এ কথাও বলা হয়েছে যে, 'আযীয' যার মত আর কেউ নেই।

এ কথাও ঠিক যে, জাগতিকভাবে কাউকে আপনি 'আযীয' বলতে পারেন। কোন বাদশাহ্ বা যে কেউ হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আযীয অর্থাৎ অপরাজিত এবং সাথে সাথে সম্মানিত সত্তা। কোন মানুষ তা হতে পারে না। এ জন্য এ গুণবাচক নাম মূলতঃ কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই বলা হয়। আল্লাহ্‌র নামসমূহের মধ্যে 'মুয়েয্‌য'ও একটি নাম। এর অর্থ এই যে, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে তিনি চান ইয্‌যত বা সম্মান দান করেন।

মুনজেদ-এ আছে, আল্ আযীয বাদশাহ্‌কেও বলা হয়, কারণ তার প্রজাদের উপর তার কর্তৃত্ব থাকে। 'আযীয' শব্দের একটি অর্থ বুযূর্গীওয়ালা, ইয্‌যতওয়ালা এবং সম্মানীত (মুকার্‌রম) ব্যক্তি।

এবার কুরআন শরীফের এমন আয়াত পেশ করছি যেখানে 'আযীয' নামের উল্লেখ হয়েছে।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ؕ
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۳۰﴾

অর্থ ঃ "এবং হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক তুমি তাদের মধ্যে তারই একজনকে রসূল করে আর্বিভূত কর, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করবে, তাদেরকে পূর্ণ কিতাব ও হিকমত্ শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে, নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়" (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১৩০)।

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, এটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া এবং কুরআন মজীদে যেখানেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এ দোয়ার উল্লেখ হয়েছে সেখানেই বলা হয়েছে, সেই রসূল কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। তারা যখন আয়াত ও হিকমতের কথাগুলো লিখে যায় তখন তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি করেন। কুরআন মজীদে সকল আয়াতেই এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র মহিমা দেখুন, যেখানে আল্লাহ্ নিজ থেকে ঐ রসূলের উল্লেখ করেছেন যেমন সূরা জুমুআর আয়াতে; সেখানে আয়াত পড়ে শোনানোর সাথেই তাদের আত্মার সংশোধনের কথা বলেছেন, পরে কিতাব ও হিকমত শেখানোর কথা বলেছেন;

সে রসূল তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত পড়ে শোনাবেন এবং সাথেই তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি করবেন। তারপর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শেখাবেন।

এর মধ্যে আরো একটি সুন্দর কথা আছে এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আত্মার পরিশুদ্ধির পরই কিতাবের এল্‌ম ও হিকমত বুঝতে পারা যায়। নতুবা পরিশুদ্ধি না হলে তো হিকমত বোধগম্য হয় না। সুতরাং কুরআন মজীদের মহান মর্যাদা, বর্ণনা ও রচনা শৈলীর অপরূপ উদাহরণ।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা যখন আপনার মজলিসে বসে থাকি তখন জাগতিক বিজয়ের প্রতি আমাদের কোন আকর্ষণ অনুভব হয় না এবং আমরা পরকালের অধিবাসী হয়ে যাই। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে সংসার কর্মে যখন ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন আবার আমাদের মনে পরিবারবর্গের জন্য সন্তানদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আপনার সম্পর্কে গাফিলতি বা আকর্ষণ কম অনুভব হয়। এ কথা শুনে আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'তোমরা যদি নিজেদের সংসার-কর্মে গিয়েও অমন অবস্থায় থাকবে সবসময় যেমন অবস্থায় আমার সাথে থাকা কালে যাক তবে তো ফিরিশ্‌তা তোমাদের ঘরে গিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করত। যদি তোমরা গুনাহ্ না করতে তবে আল্লাহ্ নূতন করে এমন জাতের মখলুক সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ্ করত যেন আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ ক্ষমা করেন। ..."

তারপর হুযূর (সঃ) বললেন, এমন তিন ধরনের ব্যক্তি আছেন যাদের দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় না। ১। ন্যায়-বিচারক ইমাম ২। রোযাদার যদি রোযা ইফতারের সময় কোন দোয়া করে ৩। মযলুমের (যার উপর যুলুম করা হয়েছে) দোয়া সোজা আকাশে পৌঁছে যায় এবং আকাশের দরজা খুলে যায় এবং আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, 'আল্লাহ্‌র ইয্‌যতের কসম, আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করব যদি কিছু দেরীও হয়" (তিরমিযী, কিতাব সিফাতুল জান্নাহ্)

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, হুযূর (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ এমন জাতির মখলুক সৃষ্টি করবেন যারা গুনাহ্ করবে যেন আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। কথাটি বুঝতে হবে। আল্লাহ্‌র এতে আগ্রহ নেই যে, মানুষ গুনাহ্ করুক। প্রকৃত অর্থ এই যে, মানুষের মধ্যে গুনাহ্‌র প্রতি প্রবণতা আছে। যদি এটা না হোত তবে তো ফিরিশ্‌তারাই যথেষ্ট ছিলেন। মানব জাতিকে সৃষ্টির কোন প্রয়োজনই ছিল না। আল্লাহ্‌র সিফত গফুর (ক্ষমাশীল)-এর সাথে ফিরিশ্‌তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এ সিফতের সম্পর্ক এমন সৃষ্টির সাথে যারা গুনাহ্ করে। সুতরাং কথা এই যে, যদি তোমরা তোমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পুরা না কর এবং ফিরিশ্‌তাদের মত হয়ে যাও তবে তো তোমাদের প্রয়োজন নেই। ফিরিশ্‌তারাই যথেষ্ট।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি হযরত রসূলে করীম (সঃ)-কে বলতে শুনেছি; হুযূর (সঃ) বলেছেন, "ইবলীস বলেছিল, হে আল্লাহ্! তোমার ইয্‌যত ও জালালের কসম! আমি তোমার আদম-সন্তানদের ঐ সময় পর্যন্ত বিপথগামী করতে থাকব যতক্ষণ তাদের মধ্যে রূহ্ আছে।" আল্লাহ্‌তাআলা তার উত্তরে বলেছেন, "আমার ইয্‌যত ও জালালের কসম! আমি ঐ সময় পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করতে থাকব যতক্ষণ তারা আমার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে" (মুসনাদ আহমদ, ৩য় খন্ড; পৃঃ ২৯; বৈরূতে প্রকাশিত)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, 'হযরত নবী করীম (সঃ) দোয়া করতেন, আউযু বেইয্‌যাতিকাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা আনতাল্লাযী লা ইয়ামুতো ওয়াল জীন্না ওয়াল-ইন্‌সো ইয়ামুতুন।" হে আল্লাহ্! আমি তোমার সত্তার ইয্‌যতের নামে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই, তুমি এমন মাবূদ যাঁর কোন লয় নেই ক্ষয় নেই, এবং জীন্ন হোক বা ইনস্ (মানুষ) হোক সবারই মৃত্যু আছে" (বুখারী, কিতাবুত্ তাওহীদ, বাব কওলুহুতাআলা ওয়াহুয়াল আযীযুল হাকীম)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, হযরত নবী (সঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে গালি-গালাজ করছিল। আঁ হযরত (সঃ) তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছিলেন এবং হাসছিলেন। ঐ ব্যক্তি গালি-গালাজের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলে হযরত আবূ বকর তার দু'একটি কথার জবাব দিলেন। এতে আঁ হযরত (সঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) আঁ হযরত (সঃ)-এর পেছনে পেছনে গেলেন। আবূ বকর (রাঃ) আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ঐ ব্যক্তি যখন আমাকে গালি দিচ্ছিল, আপনি শুনছিলেন। কিন্তু আমি যখন তার দু'একটি কথার উত্তর দিলাম, আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে এলেন কেন? হুযূর (সঃ) বললেন, 'যতক্ষণ তুমি চুপচাপ ছিলে একজন ফিরিশ্‌তা তোমার পক্ষ হয়ে জবাব দিচ্ছিলেন; কিন্তু যখন তুমি নিজেই জবাব দিতে আরম্ভ করেছিলে তখন মাঝখানে শয়তান এসে প্রবেশ করল। এমন জায়গায় আমি তো থাকতে পারি না যেখানে শয়তান প্রবেশ করে।

তারপর হুযূরে আকরম (সঃ) বললেন, হে আবূ বকর! তিনটি কথা একেবারে নির্ভুল সত্য কথাঃ ১। যে ব্যক্তির উপর যুলুম হয় এবং সে আল্লাহ্‌র খাতিরে জবাব দেয় না আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে অবশ্যই ইয্‌যত দেন এবং তার সমর্থন করেন, ২। যে ব্যক্তি সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য দান-খয়রাতের পথ খুলে দেয় আল্লাহ্ তাকে আরো প্রচুর দিতে থাকেন, ৩। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য চাইতে আরম্ভ করে। আল্লাহ্ তার জন্য অভাব-অনটন বৃদ্ধি ক'রে দেন" (মুসনাদ আহমদ)।

এটিও একটি অতি সত্য কথা যে, যে ব্যক্তি একবার মানুষের কাছে চাইতে আরম্ভ করে, তার ক্ষুধা আর কখনও নিবারণ হয় না। তার দরিদ্রতার অভাব তার পিছ ছাড়ে না। অতএব মিতব্যয়িতা ও স্বল্পে তুষ্ট হওয়া সবচে' বেশি প্রয়োজন এবং একমাত্র তাঁর কাছেই তাঁর আশিস ভিক্ষা চাওয়া উচিত। তিনি নিজ কৃপায় মানুষকে অনেক বেশি স্বচ্ছলতা দিতে পারেন। সুতরাং যাদের রিয্‌কের স্বল্পতা আছে তাদের উচিত এদিকে দৃষ্টি দেয়া অর্থাৎ আল্লাহ্ থেকে মিতব্যয়িতা ও স্বল্পে তুষ্ট হবার মত মন-প্রাণ ভিক্ষা চাওয়া উচিত। প্রকৃত সত্য এই যে, রিয্‌ক যত বেশিই হোক না কেন, মানুষের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা পূরণ ও হতাশা দূর করতে পারে না। মানব-সন্তানকে যদি একটি উপত্যকাও প্রদান করা হয়, সে বলবে এছাড়া আরো কিছু দাও। এ তো আসলে জাহান্নামের উদাহরণ। মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার জাহান্নাম কিছুতেই শীতল হয় না। একটি জগৎ দিয়ে দাও আরো একটি জগৎ চাইবে সে। গালেবের (বিখ্যাত উর্দূ কবি) একটি হাস্যরস মেশানো পংক্তি আছে, "উভয় জগৎ দান করে তিনি ভাবলেন যে, সে খুশী হবে। এদিকে সে লজ্জাবোধ করছে যে, আরো চাই কি করে।"

অথচ এটি বোকামীর চরম সীমা, আল্লাহ্‌র সামনে দু'জগতের কোন মূল্যই নেই। মানুষ যতবার চাইতে থাকুক না কেন আল্লাহ্‌র তাতে কিছুই কম হয় না। আঁ হযরত (সঃ) একবার সূচের অগ্রভাগকে পানিতে ডুবিয়ে তা বের করে উদাহরণ দিয়েছিলেন যে, এই সূঁচের মাথায় যতটা পানি এসেছে, মানুষ যত বেশি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিতে থাকুক না কেন আল্লাহ্‌র নেয়ামতের ভান্ডার থেকে অতটা স্বল্পতাও সৃষ্টি হয় না যতটা স্বল্পতা ঐ সূঁচের পানির ফলে সমুদ্রে সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যতবেশি চাও চাইতে পার, চাওয়া উচিত। অতঃপর তাঁর ইচ্ছা তিনি যতটা দিতে চান দিবেন। তিনি জানেন, কোন্ বান্দাকে কতটা দিবেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٩﴾ فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢١٠﴾

অর্থ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অতঃপর তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তাহলে জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় (সূরাতুল বাকারা ঃ ২০৯-২১০)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, "উদখুলূ ফিস্‌সিলমে কাফ্‌ফাহ্" 'আনুগত্যের মধ্যে প্রবেশ কর।' আনুগত্য মানুষকে সাফল্যমন্ডিত করে দেয়। একেবারে আরম্ভে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "তারা এ কালামের উপর ঈমান এনেছে যা তোমার উপর নাযেল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযেল হয়েছে (বাকারাহ্ ঃ ৫)। অন্যত্র বলা হয়েছে **উ'বুদূ রব্বাকুম** 'তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর,' (বাকারাহ্ ঃ ২২)। "যখনই আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত আসে" (বাকারাহ্ ঃ ৩৯) আবার বলা হয়েছে, হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) পদ্ধতি অবলম্বন কর। আবার বলা হয়েছে, এ পথে চলতে গিয়ে যদি জীবন হুমকির সম্মুখীন হয় তবুও দ্বিধা করবে না। কারণ আল্লাহ্ ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন।" (যামীমা বদর পত্রিকা, কাদিয়ান, ১৬ এপ্রিল, ১৯০৯ইং)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর কথা-বার্তা খুব সংক্ষেপে হোত। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু আমি যদি ব্যাখ্যা করতে যাই তবে অনেক সময় লেগে যাবে। অতএব হুযূর (রাঃ)-এর কথাগুলো যেভাবে ছেপেছে সেভাবেই পড়ে দিয়েছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"হে ঈমানদাররা! খোদাতাআলার পথে নিজের ঘাড় রেখে দাও। শয়তানী পথ অবলম্বন কর না কারণ সে তোমাদের শত্রু। এখানে শয়তান অর্থ এমন সকল মানুষ যারা মন্দ কাজের শিক্ষা দেয়।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের সাথীরাও অনেক সময় শয়তান হয়ে থাকে যারা মন্দ কাজের শিক্ষা দেয়। এমন ধারণা করা যে, শয়তান সবসময় অবশ্যই বাইরের থেকে আসে এবং মন্দ কাজের শিক্ষা দেয়- একথা ঠিক নয়। আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার স্বভাবের সাথে সংগতি রেখে শয়তানকে লাগিয়ে রেখেছেন। কখনও কখনও কোন ব্যক্তির স্বভাবের বিপরীত ধরনের শয়তানও তার পেছনে লেগে যায় এবং তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর একজন অনুসারী তার খেদমতে হাজির হয়ে বলল, হুযূর! যখন আমি আপনার মজলিসে বসা থাকি তখন তো আমার মনে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় না। কিন্তু যখন আমি মসজিদ নূরে নামায পড়ি তখন আমার মনে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হতে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) তখনই বুঝে ফেললেন যে, কোন নাস্তিকের সাথে তার সম্পর্ক আছে। হুযূর বললেন, তোমার সাথে কে নামায পড়ে? ভবিষ্যতে তুমি তার সাথে নামাযে দাঁড়াবে না। ঐ ব্যক্তি হুযূর (রাঃ)-এর কথামত কাজ করেছিল। তারপর থেকে আল্লাহ্‌র ফযলে তার আর কোন সমস্যা হয় নি। সুতরাং সন্দেহ বা মনের মধ্যে মন্দ ধারণাও চিন্তা শয়তান সৃষ্টি করে। আর শয়তান এরকম নয় যেমন সাধারণতঃ আমাদের লোকেরা মনে করেন। বরং মানুষের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণ শয়তান বসবাস করে যারা তাদের সঙ্গী-সাথীদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়।

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢١﴾

অর্থাৎ তারা তোমার কাছে এতীম সম্পর্কেও প্রশ্ন করে। তুমি বল, তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সংশোধন ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা উত্তম কাজ। এবং তোমরা যদি তাদের সাথে মিলে-মিশে থাক, তাহলে তারা তোমাদেরই ভাই। এবং আল্লাহ্ ফাসাদকারী ও সংশোধনকারীদের মধ্যে পার্থক্য কি তা ভাল করেই জানেন। আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে তোমাদেরকেও অবশ্যই কষ্টের মধ্যে ফেলে দিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময় (সুরাতুল বাকারাহ্ ঃ ২২১)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "মুসলমান গৃহ সমূহের মধ্যে উত্তম গৃহ সেই গৃহ যার মধ্যে এতীমের বসবাস আছে এবং যেখানে এতীমদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করা হয়। এবং মুসলমানদের গৃহসমূহের মধ্যে সবচে' খারাপ গৃহ সেই গৃহ যেখানে এতীমের বসবাস এবং এতীমের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়" (ইবনে মাজা, কিতাবুল আদব, বাবু হাক্‌কুল ইয়াতামা)।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় পৃথিবীর ধন-দৌলত, তরতাজা ও মিঠা এবং মু'মিনদের জন্য ভাল সঙ্গী যারা এর মধ্য হতে এতীম, গরীব মিসকীন এবং মুসাফীর (পথচারী)-দের জন্য দান করে। যে ব্যক্তি হারাম মাল গ্রহণ করে সে এমনই যেমন কোন ব্যক্তি খেতে থাকে কিন্তু তার পেট ভরে না। এই হারাম মাল কেয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে" (সুনান নাসায়ী, কিতাবুয্ যাকাত)।

আমর বিন শোয়ায়েব নিজের দাদার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে এসে বলল, আমার কাছে কোন মাল নেই কিন্তু আমার উপর এক এতীমের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আছে। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, ঐ এতীমের যে সম্পদ আছে তার থেকে খাওয়া পরার জন্য তুমি খুব অল্প পরিমাণ নিতে পার কিন্তু অপচয় বা বাজে খরচ যেন না কর এবং তার থেকে তুমি নিজের জন্য সম্পদ গড়তে পারবে না। আর এমনও করতে পারবে না যে, নিজের মাল [নিজের জন্য খরচ না করে] বাঁচাও" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল; ২য় খন্ড, পৃঃ ২১৫-২১৬)

এর অর্থ এই যে, যেখানে ধন-সম্পদ নষ্ট হবার আশংকা আছে সেখানে নিজের অর্থ বিনিয়োগ না করে এতীমের অর্থ বিনিয়োগ কর। এমন কাজ অবশ্যই করবে না। এতীমের অর্থ তার মালিক বা অভিভাবকের কাছে গচ্ছিত রাখা অর্থ এবং সে এতীমের অভিভাবক এবং নেগরান এবং এতীমের ধন-সম্পদেরও হেফাযতের দায়িত্ব তারই উপরে। যদি সে নিজে খুব গবীর হয়ে থাকে তবে সে কেবল ঐ এতীমের অর্থ থেকে এতটুকু খেতে পারে যাতে ক্ষুধা নিবারণ হয়। নতুবা এতীমের ধন-সম্পদের তো সে আমানতদার, রক্ষণাবেক্ষণ-কারী। সেখান থেকে সে অন্যায়ভাবে কিছু নিতে পারে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন সেখানে অনেকে নিহত হয়। নিহতদের সন্তান এবং পরিবারবর্গ থেকে যায়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, **এসলাহুল্ লাহুম খয়রুন** অর্থাৎ তাদের মঙ্গল ও উন্নয়নের চিন্তা করা বড় পুণ্যের কাজ। (যামীমা বদর, কাদিয়ান; ১৬ এপ্রিল-১৯০৯ইং)

এখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এ বিষয়টিকে আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন যে,

সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাদের সন্তানরা এতীম হয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তাদের দেখা শুনা করার আদেশ দিয়েছেন এ আয়াতে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"কোন সম্পদের মালিক এমন যার মেধার বিকাশ এখনও হয় নি, যেমন এতীম, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক যে অজ্ঞতাবশতঃ নিজের সম্পদ বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। এমন অবস্থায় তুমি (Court of Order হিসেবে) তার ধন-সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিতে পার। ঐ সমস্ত ধন-সম্পদ যার উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়-বাণিজ্য, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা চালু আছে এমন সম্পদ মেধাহীন অবুঝদের হাতে দিও না।"

এখানে দেখুন কুরআন মজীদ কেমন প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেছে। এমন সম্পদ, ধন-মাল যা এতীমের সম্পদ-তা জাতীয় সম্পদ। যদি এ সম্পদ বিবেকহীনদের হাতে ছেড়ে দাও তবে তারা তা নষ্ট করে ফেলবে। এভাবে সমস্ত জাতির সম্পদ নষ্ট হবে। অতএব এ সম্পদ জাতীয় সম্পদ। এর হেফাযত কর। যতক্ষণ তাদের মেধার বিকাশ না হয়, বুদ্ধিমান না হয় তাদের জন্য প্রয়োজন মত খরচ কর। যখন তারা বুদ্ধিমান হয়ে যায় তাদের পরীক্ষা নিয়ে দেখ যে তাদের হাতে ঐ সম্পদ ছেড়ে দিলে তারা তা নষ্ট হতে দেবে না। তারপর তাদের ধন-সম্পদ তাদের হাতে তুলে দাও। তখন অবশ্যই তাদের সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিতেই হবে।

বলা হয়েছে, তারা যতদিন তোমার অধীনে আছে তুমি তাদের সম্পদ থেকে তাদের জন্য খরচ কর। তাদের খোরাক, পোশাক, তাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য খরচ কর। তাদেরকে ভালভাল কথা ও কাজ শিখাও। এমন কথা শিখাও যেন তারা শীঘ্রই বুদ্ধিমান ও যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে উঠে। তাদের তরবিয়ত কর। তারা যেন অজ্ঞ-মূর্খ হয়ে না থাকে। তারা যদি ব্যবসায়ী বাপের সন্তান হয়ে থাকে তাদের ব্যবসায় করা শিখাও। যে যে ধরনে কাজ-কাম করে খেতে পারে তাকে সে ধরনের পেশা বা কাজ-কাম শিখাও। তাদের মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি কর। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিতে থাক। পরীক্ষা করতে থাক। যা কিছু শিখাচ্ছ তা তারা শিখতে পেরেছে কিনা। তারপর যখন বিয়ের উপযুক্ত হয় তাদের বিয়ে দিয়ে দাও। অর্থাৎ প্রায় ১৮ বছর বয়স যখন হয়ে যাবে এবং যদি দেখ যে, তারা এখন টাকা-পয়সার উপার্জন ও সংরক্ষণ করতে পারে তখন তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও। তাদের ধন-সম্পদ যতদিন তোমার হাতে আছে তাদের সম্পদ বাজে খরচ করে উড়িয়ে দিও না। এই আশঙ্কায় যে, তারা বড় হয়ে গেলে তারা তাদের ধন-সম্পদ ফেরত দিয়ে নিবে, তুমি তাদের সম্পদের ক্ষতি করবে না। যে ব্যক্তি অবস্থাশালী তার জন্য এতীমের সম্পদ দেখাশোনা করার বিনিময়ে আর্থিকভাবে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা উচিত হবে না। কিন্তু এতীম ও তার সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব যার উপরে সে যদি দরিদ্র হয় তবে সে যৎসামান্য পরিমাণ গ্রহণ করতে পারে"। (ইসলামী নীতিদর্শন, রূহানী খাযায়েন; ১০ম খন্ড; পৃঃ ৩০৬)

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

অর্থাৎ এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, এবং যদি তারা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হয়, তাহলে তারা যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ্ তাদের গর্ভাশয়ে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ হবে না। এবং তাদের স্বামীরা এর মধ্যে (নির্ধারিত সময়ের মধ্যে) তাদেরকে নিজেদের স্ত্রীরূপে ফেরত নেবার অধিক অধিকার রাখে যদি তারা আপোস-মীমাংসা করতে চায়। এবং ন্যায়সংগতভাবে কতক অধিকার নারীদের জন্য (পুরুষদের উপর) আছে যেরূপ কতক অধিকার (পুরুষদের জন্য) নারীদের উপর আছে; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের এক প্রকার প্রাধান্য আছে। এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী; প্রজ্ঞাময় (সূরাতুল বাকারা ঃ ২২৯)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

নারী জাতির অধিকার যেভাবে ইসলামে সংরক্ষিত করা হয়েছে এমন অন্য কোন ধর্মে করা হয় নি। বড় সংরক্ষিত ক'টি শব্দে বলা হয়েছে ঃ **ওয়ালাহুন্না মিসলুল্লাযী আলায়হিন্না** ঃ তাদের (নারীদের) ওপর যে দায়িত্ব আছে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের (নারীদের) অনুরূপ অধিকারও রয়েছে। কোন কোন ব্যক্তির কথা শুনা যায়; সে তার স্ত্রীকে পায়ের জুতার মত মনে করে এবং অত্যন্ত নিলর্জ্জভাবে তাদেরকে কেবল সেবা করার কাজে লাগিয়ে রাখে। গালি দেয়, অত্যন্ত নীচ মনে করে। এত কঠোরভাবে পর্দার আদেশকে প্রয়োগ করে যেমন তাদের জীবিতই কবর দিয়ে রাখে। অথচ স্ত্রীদের সাথে স্বামীদের সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত যেমন দু'জন খাঁটি ও আন্তরিক বন্ধুর মধ্যে হয়ে থাকে। **মানুষের উন্নত চরিত্রের এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের প্রথম সাক্ষী স্ত্রীরাই হয়ে থাকেন। যদি তাদের সাথেই সম্পর্ক ভাল না থাকে তবে আল্লাহ্‌র সাথে কি করে ভাল সম্পর্ক হতে পারে।** আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, খায়রুকুম খাযরুকুম লেআহ্লিহি, তোমাদের মধ্যে ভাল সে যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল" (বদর, ২য় খন্ড; নং ১৮; ২২মে ১৯০৩ইং পৃঃ ১৩৭)।

তারপরের অংশে আছে, **ওয়া আনা খায়রুকুম লে আহলি** এবং আমি তোমাদের মধ্যে নিজ পরিবারের সাথে সব চেয়ে বেশি সুসম্পর্ক রাখি ও ভাল ব্যবহার করি। সুতরাং আঁ হযরত (সঃ)-এর যে উত্তম আদর্শ তাঁর (তাঁর) কল্যাণময়ী স্ত্রীদের সাথে যা তিনি পৃথিবীর সামনে দেখিয়ে গেছেন তার মধ্যে দেখা যায় যে, তিনি স্ত্রীদের কাউকে কখনই আঘাত (মারধর) করেন নি। অর্থাৎ স্ত্রীকে স্বামীর পক্ষ থেকে মারার যে অধিকার আছে বলে মনে করা হয়েছে তা ভুল বুঝা হয়েছে। যে ব্যক্তি ভদ্র ও পবিত্র মনের অধিকারী এবং সে নিজ স্ত্রীর সাথে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার ও সুসম্পর্ক রাখে, তার স্ত্রী কখনই এতটা ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে না বা মাথা চাঁড়া দিতে পারে না যার ফলে তার গায়ে হাত তোলার (মারার) প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। আঁ হযরত (সঃ)-এর সহধর্মীণীগণ, উম্মাহাতুল মু'মিনীন অনেক সময় হুযূর (সঃ) -এর সামনে এমন কথাও বলতেন যার ফলে আঁ হযরত (সঃ) কষ্ট পেতেন। কিন্তু তিনি কখনও কারো উপর হাত তোলেন নি। জীবনে কখনও একবারও এমন ঘটনা ঘটে নি।

এর থেকে বুঝা যায় যে, আমাদের জন্য আঁ হযরত (সঃ)-এর আদর্শই অনুকরণীয় হওয়া উচিত। আমরা যেমন কুরআনী আয়াতের ভুল

অর্থ করি এবং মনে করি যে, স্ত্রীকে মারবার অনুমতি আছে একথা ঠিক নয়, এমন জায়েয নয়। আমার জানা মতে কোন কোন আহমদী এমন আছে যারা সুযোগ নেয় যে, মারার অনুমতি আছে এবং তারা স্ত্রীর উপর যুলুম-অত্যাচার করে এবং মনে করে আমরা শরীয়ত মোতাবেক করছি, এমন মনে করা সম্পূর্ণ হারাম। শরীয়ত সেটাই যা আঁ হযরত (সঃ) বুঝেছেন। হুযূর (সঃ) যেভাবে শরীয়তকে নিজের উপর প্রয়োগ করেছেন, বলবৎ করেছেন এবং স্ত্রীদের উপর প্রয়োগ করেছেন তাঁর থেকে পৃথক হয়ে শরীয়ত বানানো সম্পূর্ণ হারাম।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

কুরআন মজীদে মনোনিবেশ করে দেখলে স্পষ্ট জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র কাছে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটি একটি খুবই অসহ্য ও অগ্রহণযোগ্য বিষয় যে, কোন দম্পতি অনেক পুরনো সম্পর্ক ছিন্ন করে একে অপরকে ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে যাবে। এজন্যই তিনি তালাকের জন্য অনেক - গুলো বড় বড় শর্ত আরোপ করে দিয়েছেন। সময়ের ব্যবধানে তিনবার তালাক দিতে হবে, উভয়কে একই স্থানে বসবাস করতে হবে ইত্যাদি। এসব শর্ত এজন্য যেন, কোন সময় তাদের মধ্যে পরিবর্তন এসে যায় এবং পরস্পরের মনোমালিন্য দূর হয়ে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, ধনী আত্মীয়দের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া হয়ে যায়, অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় তারা মামলা করতে আদালতে চলে যায়। অভিজ্ঞ আদালত তাদেরকে বলেন, 'তোমরা এক সপ্তাহ পরে আসবে'। অথচ বিচারকের উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, সময়ের পরিবর্তনে বিবাদীদের মধ্যে যেন (আপোষ) হয়ে যায়, রাগ এবং অভিমান দূর হয়ে যায়, বিরোধ দূর হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যে তাদের মামলার আবেদন পত্র তাৎক্ষণিক গ্রহণ করা যুক্তিসংগত মনে করেন না।

এভাবে আল্লাহ্‌তাআলা পুরুষ ও স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করার পূর্বে অনেকগুলো অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। এসব অবস্থা এমন যে, উভয়ের জন্য নিজেদের ভাল-মন্দ বিবেচনা করে দেখার অনেক সুযোগ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, **'আত্‌তালাকো মাররাতায়নে** অর্থ ঃ (প্রত্যাহারযোগ্য) দু'বার তালাক দেয়া হয়ে গেলে, তারপর হয় স্ত্রীকে সুন্দরভাবে রেখে দাও (অর্থাৎ তালাক দেবার কথা আর বল না) অথবা সুন্দরভাবে সদয় ও সদাচরণের মধ্য দিয়ে বিদায় দিয়ে দাও" (আল্ হাকাম; ৭ম খন্ড; নং ১৩, ১০ এপ্রিল, ১৯০৩ইং)।

তালাক দু'বার বলা হয়েছে এখন বুঝে দেখ, স্ত্রীকে স্ত্রী হিসাবে রাখবে না কি অবশ্যই তালাক কার্যকর করবে। এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বার বার তালাক বলার বা তালাক দেবার প্রশ্ন যেন না উঠে। যদি তালাক কার্যকর করতেই হয়, সুন্দরভাবে ভদ্রভাবে স্ত্রীকে অনেক কিছু দিয়ে খুশী করে বিদায় দিয়ে দাও।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤١﴾

অনুবাদ ঃ এবং তোমাদের মধ্যে হতে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং তারা পেছনে স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের পক্ষে ওসীয়্যত করে যাবে (ওয়ারিশানদের বলে যাবে) যে, তাদেরকে স্বামীর ঘর থেকে এক বছর পর্যন্ত বের করে দিবে না এবং ভরণ-পোষণ দিবে। কিন্তু যদি তারা স্বেচ্ছায় চলে যায়, তবে তাদের কোন পাপ নেই; তারা নিজেদের জন্য কোন ভাল সিদ্ধান্তও নিতে পারে। আল্লাহ্ মহপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ২৪১)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন,

এখানেও জেহাদের যুগের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কারণ মুসলমান যারা শহীদ হয়েছেন, পেছনে তাদের স্ত্রীরা থেকে যেতেন। তাদের পক্ষে ওসীয়্যত (জরুরী নির্দেশ) করা হয়েছে যে, তাদেরকে এক বছর পর্যন্ত যেন ঘর থেকে বের করে দেয়া না হয়।" এখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এ আদেশকে যুদ্ধকালীন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অথচ এমন আদেশকে কোন বিশেষ অবস্থা ও যুগের সাথে বেঁধে দেয়ার প্রয়োজন নেই। সর্বকালের জন্য এ ধরনের আদেশ অত্যন্ত সুন্দর ও অর্থবহ। যতবেশি ব্যাপকভাবে এ আদেশকে প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল। আজকালও এ আদেশ প্রযোজ্য হচ্ছে অথচ এখন কোন যুদ্ধকালীন অবস্থা বিরাজ করছে না। যে মানুষ নিজ স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে (যেমন মারা গেছে) তাদের পরিবারবর্গের মানুষকে নসীহত করা উচিত তারা যেন ঐ স্ত্রীদের নিজ স্বামীগৃহে কমপক্ষে এক বছর থাকার সুযোগ-সুবিধা দেয়। তবে হ্যাঁ, স্ত্রীরা নিজ থেকে যদি চলে যায় তবে যেতে পারে। আর যদি না যেতে চায় তবে তাদের অধিকার আছে এখানে কমপক্ষে এক বছর থাকার যেখানে সে স্বামীর সাথে এত কাল জীবন যাপন করেছে।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦١﴾

অনুবাদ ঃ (এবং স্মরণ কর সেই ঘটনাকে) যখন ইব্রাহীম বলেছিল, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক কীভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর। তুমি আমাকে দেখাও। তিনি বললেন, 'তুমি কি ঈমান আন নি'? সে বলল, 'হ্যাঁ (ঈমান তো অবশ্যই এনেছি), কিন্তু (প্রশ্ন এজন্য করেছি) যেন আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে'। তিনি বললেন, 'তুমি চারটি পাখী নিয়ে রাখ, ওদেরকে নিজের প্রতি পোষ মানাও। অতঃপর তুমি ওদের মধ্য হতে এক এক অংশ এক এক পাহাড়ের উপর রেখে আস। তারপর ওদেরকে ডাক, তারা তোমার কাছে ছুটে আসবে। এবং জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়' (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ২৬১)।

এখানে অনুবাদ করতে গিয়ে **ফাসুরহুন্না ইলায়কার** অনুবাদ কোন কোন আলেম ভুল করেছেন। তারা যে অনুবাদ করেছেন তা আরবী ভাষার নিয়ম এবং গ্রামারের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভুল অনুবাদ। **'ফাসুরহুন্না'**র অনুবাদ এরূপ হতে পারে ওদের টুকরো টুকরো করে দাও। কিন্তু যদি এ অর্থ করতে হয় তবে ফাসু-রহুন্নার সাথে 'ইলায়কা' আসবে না। ফাসু-রহুন্না-র সাথে যদি 'ইলায়কা' যাকে তবে টুকরো টুকরো টুকরো করার অর্থ হতে পারে না। অতএব এখানে **ফাসুরহুন্না ইলায়কার** অর্থ

হবে 'তুমি ওদেরকে নিজের প্রতি পোষ মানাও, তোমার সাথে তাদের ভালবাসা সৃষ্টি কর। ওদের টুকরা বা কীমা করার অর্থের পরিবর্তে ওদেরকে পোষ মানাও অর্থ খুবই স্বাভাবিক। মানুষ যেমন তোতা পাখী বা কোন কোন পাখীকে নিজের কাছে রেখে পুষতে থাকে, এমন পোষা পাখীকে দূর থেকে ডাকলে সে চলে আসে মালিকের কাছে। এখানেও তেমন বলা হয়েছে যে, চারটি পাখীকে নিজের সাথে রেখে পোষ মানাও তারপর তাদের বিভিন্ন পাহাড়ের উপর ছেড়ে দিয়ে আস। তারপর ডাক, দেখবে ওরা তোমার কাছে ছুটে আসবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীমকে তারা প্রশ্ন করেছিল যার জবাব আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে শিখিয়েছেন যে কীভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন। দেখ, ঐ চারটি পাখী যাদের শরীরও আছে রূহ্ও আছে। তাদেরকে তুমি মাত্র ক'দিন লালন-পালন করেছ, পুষেছ, এরই মধ্যে এতটা হয়েছে যে, তুমি ডাকলে এরা পাহাড়ের উপর থেকে তোমার ডাক শুনে ছুটে চলে আসে। তবে কি আমি যিনি এদের সৃষ্টি করেছি, আমি এদের প্রকৃত মালিক, আমি এদের প্রতিপালক, আমার ডাকে এদের শরীরের অঙ্গগুলো পুনরায় একত্র হবে না? এ দৃশ্য ও কর্মকান্ড দেখে বল তোমার কি বলার আছে?" (নূরুদ্দীন, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৭৮, ১৭৯)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, আয়াতের শেষ পর্যায়ে আল্লাহ্র সিফত আযীয ও হাকীম বর্ণিত হয়েছে। অর্থ এই যে, তাঁর খুব শক্তিশালী প্রভাব ও বিজয় এমন যে, প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ধাবমান। এমন কি কোন মানুষ যখন আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করেন তখন তার প্রতি এক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়। যার প্রমাণ সূরাতুল আদীয়াত এ আছে। আযীয ও হাকীম থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে হিকমত আছে, প্রজ্ঞা আছে অযথা দুঃখ নেই (আল্ হাকাম, ২৪ এপ্রিল, ১৯০৩ইং পৃঃ ৯)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

'আযীয' খোদাতাআলার নাম। তিনি তাঁর ইয্যত কাউকে দেন না। তবে হ্যাঁ, যারা তাঁর প্রেমে বা ভালবাসায় আসক্ত হয়ে তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন তাদেরকে ইয্যত দেন। 'যাহের' আল্লাহ্র একটি নাম। তিনি তাঁর যহুর (বিকাশ) কাউকে দেন না। তবে হ্যাঁ, যারা তাঁর এত নিকটের যে, তাদের মধ্যে তাঁর তৌহীদ বিকশিত হয়েছে, তাঁর একত্ব বিকশিত হয়েছে, তারা তাঁর ভালবাসায় এভাবে নিজেদেরকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্র সিফত বিকশিত হয়েছে। তিনি তাদেরকে নিজ নূর থেকে নূর প্রদান করেন। নিজ জ্ঞান থেকে জ্ঞান দান করেন। তারপর তারা নিজেদের জান-প্রাণ দিয়ে সমস্ত ভালবাসা দিয়ে নিজ প্রাণ-প্রিয় প্রভুর ইবাদত করেন এবং তারা তাঁর সন্তুষ্টিকে এভাবে চান যেভাবে তিনি তাদের থেকে আশা করেন।

মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত করে বলে দাবী করে। কিন্তু ইবাদত কি কেবলমাত্র অনেকগুলো সিজদাহ্ রুকূ ও কিয়াম দ্বারা সম্পন্ন হয়? অথবা যারা অনেকবার তসবীহ্ দানা টিপে তাদেরকে খোদা-প্রেমিক বলা যেতে পারে? বরং ইবাদত তাকে দিয়ে হতে পারে যাকে আল্লাহ্র ভালবাসা এতটাই নিজের প্রতি আকর্ষণ করে যে, তার নিজ সত্তা মাঝখান থেকে উঠে যায়।"

এখানে তসবীহ্ দানার উল্লেখ হয়েছে। স্মরণ রাখা দরকার যে, আঁ হযরত (সঃ) খোলাফায়ে রাশেদীন, তারপর আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রথম শ্রেণীর সাহাবায়ে কেরাম তারপর তাবেয়ীন এঁরা কেউই তাসবীহ্ দানা গণেন নি। এসব বাহানা পরবর্তীকালের বানানো। কতকগুলো দানার মালা হাতে নিয়ে গণনা চলছে যেন মানুষ দেখে যে, আমরা কত বড় বুযূর্গ মহিলা। তাসবীহ্ করার মাঝে মাঝে প্রয়োজনে কাউকে গালি দিচ্ছে, কাউকে অন্য কোন বাজে কথা বলছে। এসব চলছে তসবীহ্র সাথে সাথে। আসলে এ প্রথা আঁ হযরত (সঃ) অথবা সাহাবায়েকেরামের বা খোলাফায়ে রাশেদীন বা তাবেয়ীন তাবা তাবেয়ীন থেকে আসে নি। অনেক পরে এ প্রথা চালু হয়েছে।

তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে আবার পড়ছি ঃ

"প্রথমতঃ খোদার অস্তিত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। অতঃপর খোদার সৌন্দর্য এবং অনুগ্রহের সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকেবহাল থাকতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এরূপ হতে হবে যেন তাঁর প্রেমের জ্বালা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এ অবস্থা প্রতি মুহূর্তে চেহরায় প্রকাশ পেতে থাকে। খোদার মহিমা হৃদয়ে এরূপভাবে জাগ্রত থাকবে যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁর সত্তার সামনে মৃত সাব্যস্ত হবে। প্রত্যেক প্রকার ভয়-ভীতি কেবল তাঁরই সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। কেবল তাঁরই বিরহ বেদনার স্বাদ পেতে হবে, তাঁরই নিঃসঙ্গতায় শান্তি পাওয়া যাবে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে হৃদয়ের শান্তি লাভ হবে না। যদি অবস্থা এরূপ হয়ে যায় তবে এর নাম ইবাদত।... খোদাকে প্রকৃত প্রিয়তম হিসাবে পেয়ে তাঁর ইবাদত করাই তো 'বেলায়েত', (বন্ধুত্ব-একটি আধ্যাত্মিক স্থান) যার উপর আর কোন স্থান নেই বা স্তর লাভের চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, খোদার প্রেম অন্তর জুড়ে বিরাজ করবে। অন্তর কেবল তাঁরই উপর ভরসা করবে, কেবল তাকেই পসন্দ করবে। সবকিছুর উপর তাঁকেই প্রাধান্য দিবে এবং তাঁকে স্মরণ করাই জীবনের আসল উদ্দেশ্য মনে করবে। যদি ইব্রাহীমের ন্যায় নিজ হাতে নিজ প্রিয় পুত্রকে জবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য ইশারা করা হয়, তবে এমন কঠোর নির্দেশকেও ভালবাসার আবেগের সাথে তা পালন করবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্ট হতে হবে যাতে তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে কোনই ফাঁক থেকে না যায়। এটি বড়ই সঙ্কীর্ণ দরজা এবং এ শরবত বড়ই তিতা। খুব অল্প মানুষ এ দরজায় প্রবেশ করে এবং এ শরবত পান করে" (হাকীকাতুল ওহী; রূহানী খাযায়েন, ২২ খন্ড পৃঃ ৫৪, ৫৫)।

এরপর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) সানী খুতবা পড়েন। তারপর বলেন,

আমার পূর্বের কাশিটা আল্লাহ্র ফযলে কিছুটা কমেছে। কোন অস্থিরতার কারণ নেই, কেউ অযথা অস্থির হবেন না। যে চিকিৎসা চালাচ্ছি তাতে যথেষ্ট উপকার পেয়েছি। যে আঘাত পেয়েছিলাম তাতেও উপশম হয়েছে।"

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন ২৯ মার্চ, ২০০২ইং অনুসরণ করা হয়েছে)

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(১৫-০১-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রশ্ন নং ১ ঃ হুযূর বর্তমানে আমরা খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর কাছ থেকে ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়াদির সম্পর্কে পরামর্শ ও নির্দেশ নিয়ে উপকৃত হয়ে থাকি। যখন আমাদের জামাত আরও বহুগুণ বেড়ে যাবে তখন কীভাবে পৃথিবীর সব আহমদী হুযূরের কাছ থেকে পরামর্শ ও নির্দেশ নিবে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ খলীফার জন্যে এটা বোঝা নয়। তিনি স্বেচ্ছায় এ বোঝা নিয়ে নেন। জামাত বাড়বে, কাজও বাড়বে কিন্তু ভবিষ্যতে ইন্‌শাআল্লাহ্, এমন সব মাধ্যম সৃষ্টি হবে তখন আমাদের জন্যে এ কাজ সহজতর হবে। আহমদীরা খলীফাতুল মসীহ্-এর কাছ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে পরামর্শ ও নির্দেশ নিতে পারবে। "লাজনা ইমাইল্লাহ্", "খুদ্দামুল আহমদীয়া" ও "আনসারুল্লাহ্" সংগঠনের সদস্য ও সদস্যাগণ অবিরত কাজে খলীফাকে সাহায্য করে থাকেন। ভবিষ্যতেও তারা সাহায্য করেন। তারা অনেক চিঠির সারসংক্ষেপ তৈরী করে খলীফাতুল মসীহ্-এর সামনে রাখেন। যদি খলীফা আসল চিঠি নিজে পড়তে চান তখন তিনি সেই পত্র নিজে পড়ে তারপর উত্তর নিজের ব্যক্তিগত সচিবকে দিয়ে লিখিয়ে থাকেন। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে ভবিষ্যতেও কাজ চলতে থাকবে।

প্রশ্ন নং ২ ঃ আমরা যখন হাঁচি দিই তো 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলি, আমার প্রশ্ন হল, যখন আমরা হাই তুলি তখন আমাদের কোন্ দোয়া পড়া উচিত?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হাই তোলা আল্লাহ্‌তাআলার ফযলের একটি আর এর পরও 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্' বলা যেতে পারে। আর হাই তোলার সময় মুখের সামনে হাত রাখা উচিত।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ হুযূর, আপনি Coke কেন খান না?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটি স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর তাই আমি এটা পান করি না। কোক নামক নামক পানীয় প্রস্তুতকারক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কোকা কোলা কোং, তাদের কোক ব্রান্ডের পণ্যে এক রকম পদার্থ মিশিয়ে থাকে যাতে মানুষ ঐ পানীয় খেতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এটা এক রকম খুব হাল্‌কা ধরনের মাদকাশক্তির মত হয়ে থাকে। আমি এভাবে কোন পানীয়-এর ওপর আসক্ত হতে চাই না, তাই আমি কোক্ খাই না। এটা আস্তে আস্তে পেটকে খারাপ করে দেয়। কারও কারও কোক খাওয়ার ফলে হাঁপানী রোগও হয়। হুযূর (আইঃ) বলেন, তিনি আফ্রিকা মহাদেশে বহু লোককে কোক পান করতে দেখেছেন এবং মর্মাহত হয়েছেন যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা তার চেয়ে অনেকগুণ ভাল প্রাকৃতিক ফলের রস ও ডাব জাতীয় পানীয় দিয়েছেন অথচ তারা ঐ নিয়ামত বাদ দিয়ে কোক্ পান করছেন!

হুযূর (আইঃ) এ পর্যায়ে একটি মজার কথাও বলেন, একবার নাকি সউদী আরবে কোকা কোলা কোং, এর প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোক-এর বাজার নষ্ট করার ফন্দি আঁটে এবং অপপ্রচার করতে শুরু করে যে, কোকে তো মদ মেশানো হচ্ছে কিন্তু এর ফলে কোকের বিক্রী দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিলো!

[এ পর্যায়ে জনাব ফিরোজ আলম সাহেব উর্দূ কবি জনাব ওবায়দুল্লাহ্ আলীম সাহেব এর ঐ কবিতার বঙ্গানুবাদ পেশ করেন যেটি গত মুলাকাত-এ শওকাত বেগম গেয়ে শুনিয়েছিলেন। এ অনুবাদের পর শওকাত বেগম বাংলার সাথে মিলিয়ে বালাগাল্ ওলা বে কামালেহী ... গেয়ে শোনান]

প্রশ্ন নং ৪ ঃ হুযূর, পবিত্র কুরআন এবং হাদীস শরীফেও বেশি বেশি প্রশ্ন করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। দয়া করে এ বিষয়টি একটু আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ পবিত্র কুরআনের যে আয়াতের প্রতি আপনি ইঙ্গিত করেছেন সেখানে বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে। যখন আল্লাহ্‌তাআলা ওহী ও ইলহাম করে মহানবী (সঃ)-এর নিকট পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করছিলেন তখন কারোর জন্যই হঠাৎ করে একটা গুরুত্বহীন বিষয়ে মহানবী (সঃ)-কে প্রশ্ন করে বিব্রত করা সমীচীন ছিল না। আল্লাহ্‌তাআলা চাইলে এমন কিছু কাজ-কর্ম মুসলমানদের জন্য অবশ্য-করণীয় বলে ঘোষণা করতে পারতেন যেগুলো তারা বোঝা মনে করতেন। এ কারণে পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে সে যুগে অনাবশ্যক প্রশ্ন করা নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল যাতে উম্মতের জন্যে কাঠিন্য সৃষ্টি না হয়। নচেৎ সাধারণভাবে প্রশ্ন করাকে তিনি নিরুৎসাহিত করতেন না। প্রশ্ন করার সুযোগ তিনি সর্বদাই দিয়ে থাকতেন। ছোট ছোট শিশুও প্রশ্ন করতো। সকল শ্রেণীর মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেয়া হতো।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ হুযূর, পবিত্র কুরআনের সূরাতুন্ নিসার ১৫৮ ও ১৫৯ আয়াতে ইহুদীদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। এখানে হত্যার ওপরে বেশি জোর দেয়া হয়েছে। তারা ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল। হুযূর, এখানে 'কতল' শব্দটি আগে কেন দেয়া হলো?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ ইহুদীদের দাবী, তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে। সেজন্যে আল্লাহ্‌তাআলা প্রথম কতল বা হত্যার প্রশ্নটি এনে বলেছেন যে, তারা তাকে হত্যা করতে পারে নি। 'সালাবা' অর্থ ক্রুশে দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করা। তাই আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, তারা তাকে তরবারী বা অন্য কিছু দিয়ে কতল বা হত্যা করতে পারেনি এমন কি ক্রুশে দিয়েও হত্যা করতে পারে নি।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ সূরা নাজমের ৪৩ আয়াতে আছে নিমিত্ত ও কারণের সকল শৃঙ্খল তোমার প্রতিপালকের নিকট গিয়ে শেষ হয়। হুযূর বিষয়টি বড় জটিল। একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আন্না ইলা রব্বিকা মুনতাহা- এ আয়াতটি স্পষ্ট এদিক থেকে যে, আপনি যা-ই করেন তার চূড়ান্ত রূপটি যা প্রকাশ করতে পারে তা আল্লাহ্‌র হাতে। তার পরিকল্পনা করার কাজ আল্লাহ্‌র

হাতে। আপনি যা-ই কিছু করেন তার ফলাফল কীভাবে প্রকাশ পাবে তা আল্লাহ্‌র হাতে। আপনি যে অনুবাদ পড়েছেন তা ভুল। 'মুনতাহা' সব কিছুর শেষ আল্লাহ্‌র হাতে, কারণ নয়। এর চূড়ান্ত রূপ বা আকার কী হবে তা আল্লাহ্‌র হাতে।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ হুযূর মাওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেবের নামের সাথে সব সময় "রাযিআল্লাহ্ আনহু" আপনি বলে থাকেন অথচ তিনি আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফার (রাঃ) হাতে বয়াত না করে আলাদা জামাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ বিষয়ে কিছু বলুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ কারণ, মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়ালের হাতে বয়াতও করেছিলেন। আমরা এ জন্য তাঁর নামের পরে "রাযিআল্লাহ্ আনহু" বলে থাকি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেবকে সাদরে নিজের দিকে টেনে আনছেন ও বলছেন, "আসুন আমাদের পাশে বসুন। এক সময় তো আপনি আমাদের খুবই কাছের ছিলেন।" একবার মাওলানা সাহেবের জ্বর হয়েছিল। তিনি এতই ভয় পেয়েছিলেন, মনে করছিলেন যে, তাঁর প্লেগ হয়েছে এবং তিনি বাঁচবেন না। সে সময় মাওলানা সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে খবর পাঠালেন এবং একবার এসে তাঁকে দেখে যেতে বললেন। প্লেগ্ ছোঁয়াচে রোগ কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কোন দ্বিধা না করে সংগে সংগে মাওলানা সাহেবকে দেখতে গেলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর গায়ে হাত দিয়ে মাওলানা সাহেবকে বললেন, আপনার গায় তো কোন জ্বর নেই, আপনার অসুখ সেরে গেছে। আর অলৌকিকভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতের স্পর্শে মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব সেবার আরোগ্য লাভ করেছিলেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি তাঁর নামের পরে "রাযিয়াল্লাহুতাআলা আনহু" পড়ার পক্ষপাতি।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ যদি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয় তো তার পর পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যুদ্ধ বাঁধলে তো উভয় দেশই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে আমি আশা করি পারমাণবিক যুদ্ধ হবে না, কারণ দুই দেশের হাতেই "এটম বোমা" আছে। তবে "এটম বোমা" ব্যবহার না করেও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচলিত ধরনের যুদ্ধ বেঁধেও যেতে পারে। সেটা করলেও দুটি দেশই ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ যদি কোন ব্যক্তির অনেক ঋণ থাকে তো সেই ব্যক্তি কি হজ্জে যেতে পারে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, ব্যাংক থেকে ঋণ-এর বোঝা মাথায় নিয়ে কোন ব্যক্তির জন্য হজ্জ ফরয নয়।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ মহানবী (সঃ)-এর বাবা মহানবী (সঃ)-কে মানেন নি এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বাবাও তাঁর হাতে বয়াত করেন নি। এ দু'টি ঘটনার মধ্যে আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ আছে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ মহানবী (সঃ)-এর বাবা তো মহানবীর জন্মের পূর্বেই মারা গিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি মূর্তি পূজা করতেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বাবা হযরত মসীহ্ মাওউদ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও জীবিত ছিলেন। এ দুই এর মধ্যে আমি তো কোন মিল দেখতে পাচ্ছি না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বাবার মৃত্যুর পূর্বে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে ইল্‌হাম আসল **'আততারেক ওয়ামাত্তারেক'** অর্থাৎ সেই রাতেই একটা খুব বড় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ বুঝতে পারলেন এটা তাঁর বাবার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ- তাই তিনি স্বাভাবিক নিয়মে চিন্তিত হয় পড়লেন যে, তাঁর জীবন নির্বাহের ভবিষ্যত ব্যবস্থা কী হবে! তখন তার কাছে আবার ইলহাম আসলো **'আলায়সাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু'** অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? এ ইলহামটি খুবই প্রতাপপূর্ণ ছিল। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সব দুশ্চিন্তা ত্যাগ করলেন। তিনি একটি লোককে অমৃতস্বর পাঠিয়ে ইলহামের শব্দাবলী একটি আংটিতে খোদাই করে আনা আর তিনি তা পরতেন। এবং জামাতেও এর প্রচলন আছে। মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ঐ আংটিটি আমি প্রতি জুমুআর দিন পরে থাকি।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ সিরাজুল হক সাহেব কেনাডা থেকে জানতে চান, আমাদের বইগুলোতে সমাজের বড় বড় ব্যক্তিদেরকে 'জিন্ন' এবং সাধারণ মানুষদের 'ইনসান' বলা হয়েছে। আর এক জায়গায় পবিত্র কুরআন বলেছে, 'জিন্ন' কে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানুষকে কাদামাটি থেকে, এর অর্থ কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এ বিষয়টির দীর্ঘ আলোচনা দরকার হবে। আমার বই "Revelation Rationality Knowledge & Truth" পড়লেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। এ পুস্তক পাঠ করলে তিনি আশ্চর্য হবেন কুরআনের যে কথা-জিন্নকে আগুন থেকে আর মানুষকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে- তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ হুযূর বিবাহ-বিচ্ছেদের পরবর্তী সময়ে ক্ষয়-ক্ষতি এড়াতে সন্তানদের ব্যাপারে করণীয় কি থাকতে পারে।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ তালাকের পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয় সে জন্যে প্রথমেই চেষ্টা করা উচিত। ইসলামের শিক্ষানুসারে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে সন্তানদের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। সন্তানদের স্বার্থ যেন কোনভাবে ক্ষুণ্ন না হয়। সাথে সাথে এ সুযোগও থাকতে হবে যেন পিতা তার সন্তানদের দেখতে পারেন। তাদের পিতাকে তাদের দেখা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তারা বড় হলে কাযী তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তারা বাবার সাথে থাকবে না মার সাথে। তারা তাদের ইচ্ছামত বাবা বা মায়ের সাথে যেতে পারবে।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ কেউ যদি ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে না মানে তো কি ক্ষতি হতে পারে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ তিনি কার সাথে কী ব্যবহার করবেন সেটা আল্লাহ্‌তাআলার উপরই পুরাপুরি নির্ভর করে। সেটা তাঁর দয়া ও মেহেরবানীর ওপর নির্ভর করে। যাদের দলকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের সংবাদ পৌছানো হয় নি বা যারা সংবাদ পায় নি বা পায় না বা পেলেও ভুল তথ্য পেয়ে মানে নি তাদের বিষয়টি আল্লাহ্ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন। এ বিষয়টি আমরা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ রসূলে করীম (সঃ)-এর ক্ষেত্র দেখতে পাই। পৃথিবীতে এমন কোটি কোটি মানুষ আছে যাদের কাছে রসূলে করীম (সঃ)-এর পয়গাম পৌছে নি বা সঠিকভাবে পৌছে নি। শত্রুরা যেভাবে তাঁর (সঃ) সম্বন্ধে সংবাদ পৌছিয়েছে তারা সেভাবেই পেয়েছে। সুতরাং এসব লোকদেরকে, যারা তাঁর ওপরে ঈমান আনতে

পারেন নি কোনভাবেই দোষারোপ করা যায় না। যারা সঠিকভাবে পয়গাম পায় নি তাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা দোষী সাব্যস্ত করবেন না।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ সন্তানদের জন্মের কয় দিনের মধ্যে আকিকাহ্ হওয়া উচিত?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ জন্মের সাত দিনের মধ্যেই আকিকাহ্ দেয়া উচিত।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ হুযূর, আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ জামাতের বিভিন্ন কাজ করে আসছেন। আপনি আপনার নিজের পরিবারের জন্য কীভাবে সময় বের করেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আমি যখন দুপুরে ও রাতে আমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খেতে বসি সেই সময় আমি তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি এবং সামগ্রিকভাবে তাদের খবরা-খবর নিয়ে থাকি। এছাড়া তাদের কোন প্রয়োজন হলেও তারা আমার সাথে যোগাযোগ করে থাকে।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ কুরআন পড়ার জন্যে কোন নিষিদ্ধ সময় আছে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, পবিত্র কুরআনের পাঠ কোনো সময়ই নিষিদ্ধ নয়। যখন মহিলাদের মাসিক হয় তখন শুধু তাদের খালি হাতে কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধাজ্ঞা আছে। তারা হাতমোজা পড়ে পবিত্র কুরআন পড়তে পারেন। কোন অবস্থাতেই কুরআন করীমের তেলাওয়াত নিষিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আঃ)-এর নামের সাথে তাঁর মায়ের নাম যুক্ত হওয়ার কারণ কি? অন্য কোন নবীর নাম তো এ রকম নয়। কোন এক অ-আহমদী এথেকে এ দলীল দিয়েছেন যে, ঈসা (আঃ) যখন আসবেন তখন পূর্বের ঈসাই (আঃ) আসবেন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটি একেবারেই অযৌক্তিক ও একটি অগ্রহণীয় খোঁড়া যুক্তি। আসলে তাদের মুখ বন্ধ করার জন্যে তাদের আপত্তি খন্ডন করার জন্য আমরা এটিকে অন্যভাবে ব্যবহার করতে পারি। অনেক অ-আহমদী এমন আছেন যারা বলেন যে, পূর্বে কোন নবীর যুগ্ম নাম ছিলো না। তাদের নাম একক শব্দের ছিলো। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্বন্ধে তারা আপত্তি করেন যে, মির্যা সাহেবের নামও একটি যুগ্ম নাম। গোলাম আহমদ একটি যুগ্ম নাম। তাদের মুখ বন্ধ করার জন্যে আমরা বলি হযরত ঈসা (আঃ)-এর নামও তো মসীহ্ ইবনে মরিয়ম এটি একটি যুগ্ম নাম যা আল্লাহ্‌তাআলা ইলহাম মারফত হযরত মরিয়মকে শিখিয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-কে আমরা আল্লাহ্‌তাআলার নবী ও রসূল হিসেবে মানি। খোদার পুত্র হিসেবে মানি না।

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ পবিত্র কুরআনে কোনো দোয়া 'রব্বানা' আবার কোনো দোয়া 'আল্লাহুম্মা' দিয়ে শুরু হয়েছে। এর তাৎপর্য কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ রব্বানা শব্দ যেখানে ব্যবহার হয় সেখানে অত্যন্ত নিকটের ভাব প্রকাশ করে আর মানুষের একটি ব্যক্তিগত ও নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যখন 'রব্বি' বা 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' বলা হয় তখন আমার প্রভু অথবা আল্লাহ্‌র সাথে ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতার দিকে ইঙ্গিত করে। আর **'আল্লাহুম্মা'** শব্দ যেখানে ব্যবহৃত হয় সেখানে একটি সাধারণ সার্বভৌম ভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বা প্রয়াসের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ যারা সুদখোর তাদের কাছ থেকে কি জামাতের চাঁদা নেয়া যায়? তাদের দাওয়াত খাওয়া এবং তাদের জানাযা পড়া বৈধ কিনা?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যারা সুদ্-ভিত্তিক ব্যবসায় করেন তাদের কাছ থেকে জামাত চাঁদা নিবে না। তারা দাওয়াত করলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। জানাযা সব মুসলমানেরই মৌলিক অধিকার। একবার ডেনমার্কে দুর্ঘটনায় কিছু মুসলমান মারা যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (রাহেঃ) তাদের জানাযা পড়তে বলেন। সেখানকার মুরব্বী আপত্তি করেন যে, তারা তো আহমদী নয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন, আহমদী অ-আহমদীর বিষয় নয়, তাদের জানাযা পড়ুন। মৃত মুসলমান মাত্রেরই জানাযা পড়া দরকার। জানাযার পরই তাকে কবরস্থ করতে হয় এটা তার মানবিক অধিকার।

প্রশ্ন নং ২০ ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে "মসীহ্ মাওউদ" বলা হয় কেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ কেননা, এটা বলা ছিলো যে, মসীহ্ (আঃ) পুনরায় আবির্ভূত হবেন। কিন্তু মসীহ্ তো তাঁর ব্যক্তি সত্তায় আসতে পারেন না। তিনি প্রতিনিধিত্বরূপে আসবেন। যেহেতু রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, মসীহ্ (আঃ) পুনরায় আগমন করবেন তাই তাঁকে মসীহ্ মাওউদ বা প্রতিশ্রুত মসীহ্ বলা হয়। যিনি আসবেন তার জন্যে 'প্রতিশ্রুত' শব্দটি উপাধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বের মসীহ্ অর্থাৎ মুসায়ী মসীহ্ (আঃ)-এর জন্যে প্রতিশ্রুত শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে না কেননা, তিনি অতীত হয়ে গেছেন।

প্রশ্ন নং ২১ ঃ "রাত কানা" কাকে বলা হয়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ ইংরেজীতে এটাকে Night-Blindness বলে। "রাত কানা" ব্যক্তি একেবারে অন্ধ হয় না। দিনের বেলায় সে মোটামুটি দেখতে পারে, কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন আলো কম যাকে তখন সে ভাল করে দেখতে পারে না। বিশেষতঃ বিভিন্ন রঙ্গের মধ্যে তফাত করতে পারে না।

প্রশ্ন নং ২২ ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পুস্তক থেকে জানা যায় মানবাত্মায় অবিচ্ছেদ্যভাবে একটি অদৃশ্য সত্তার আকর্ষণ বিদ্যমান। মানুষের আত্মার ভিতরে শিশুকাল থেকেই এ আকর্ষণ থাকে। দয়া করে এ বিষয়টা আরও ব্যাখ্যা করুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, "ইসলামী নীতি দর্শন" বইতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ কথা লিখেছেন। এখানে অদৃশ্য সত্তা বলতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এখানে আল্লাহ্‌র সত্তার কথাই বলেছেন। আর মানুষের জন্মের যে নীল নক্‌শা রয়েছে তাতে আল্লাহ্‌র সত্তার প্রতি আকর্ষণ-বৈশিষ্ট্য খোদাই করে দেয়া হয়েছে। এবং এটাই কুরআন করীমে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা আত্মাকে বল্লেন, আলাসতু **বিরব্বিকুম** (আমি কি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক নই) তখন মানবাত্মা জবাব দিয়েছিল **ক্বালু, বালা** (বলেছিলো, কেন নয়, অবশ্যই)। জন্মের পূর্বেই আত্মা এভাবে জবাব দিয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌র সাথে আত্মাগুলোর বাস্তবিকই কথোপকথন হয়েছে। এখানে আত্মার সহজাত বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করার জন্যে আল্লাহ্ এমন বর্ণনা দিয়েছেন কুরআনে করীমে। মানুষ যদি চিন্তা করে তাহলে বুঝতে পারে নিশ্চয় তার এক স্রষ্টা রয়েছেন সে নিজে নিজে সৃষ্ট হয় নি।

সংকলন -নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

পুস্তক পরিচিতি

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) রচিত
Revelation Rationality Knowledge and Truth
বইটির পরিচিতি ও সারসংক্ষেপ

ভূমিকা ঃ

"Revelation Rationality Knowledge and Truth" বইটির বাংলা অনুবাদ আমি 'ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য' শিরোনামে করতে চাই।

আহমদী জমাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বিরচিত এই পুস্তকটির বক্তব্য আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। বছর দুয়েক আগে সরকারী এক কর্মসূচীতে সপ্তাহ দু'য়েকের জন্য আমার কানাডা যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল এবং ঘটনাক্রমে সেখানে বসবাসরত আমার স্নেহধন্য ছাত্র ডঃ আব্দুল বাতেনের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ফিরার পথে আমাদের সফরকারী দলটিকে ডঃ বাতেন তার বাসায় মধ্যাহ্ন ভোজের আমন্ত্রণ জানায় ও বিমান বন্দরে পৌছার পূর্বে আমাদের জামাতের এক মসজিদ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে। সেখানকার কর্মরত এক পাকিস্তানী মিশনারী মহোদয় আমাকে সহ দলের আরো তিনজনকে এক কপি করে আলোচ্য বইটি তোহ্ফা হিসাবে প্রদান করেন। বইটির সাথে আমার প্রথম পরিচিত হওয়ার এই হলো সংক্ষিপ্ত পটভূমি।

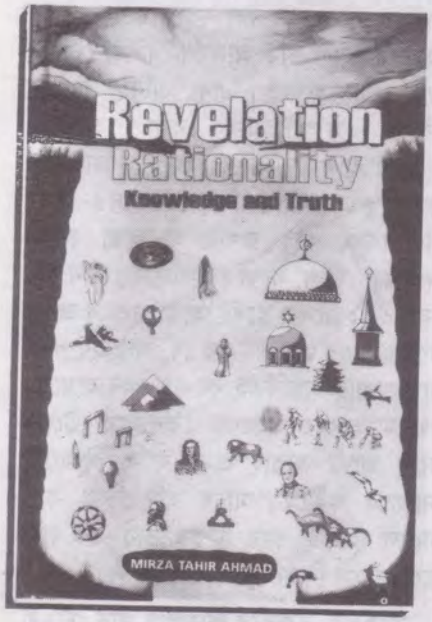

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

বইটির পুরোটা না হলেও সার সংক্ষেপ অনুবাদ করার ইচ্ছা তখন থেকেই আমার মনে জাগ্রত ছিল। কিন্তু দাপ্তরিক বিভিন্ন কাজ-কর্ম নিয়ে ক্রমাগত ব্যস্ততার ফলে তা এখনো বাস্তবায়িত হতে পারে নি। তবে, যখনই সুযোগ পেয়েছি বইটি পড়েছি, এবং বইটির ভিতরেই বাংলায় মূল বক্তব্য ও আমার উপলব্ধিকে সংক্ষেপে টুকে রেখেছি। আমার বিশ্বাস, আর কিছু না হোক অন্ততঃ এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকেও যদি আমার দেশের আপামর জনসাধারণ এবং বিশেষ করে আহমদী পত্রিকার পাঠকদের নিকট তুলে ধরতে পারি, তাহলে যুগ-ইমামের কালজয়ী চিন্তা-চেতনার সাথে তারা সামান্য হলেও পরিচিত হবে। আমার অন্তরের এই তাগিদ থেকেই এটির সার সংক্ষেপ হিসাবে প্রকাশের এই প্রচেষ্টা।

যাক, ভূমিকা আর না বাড়িয়ে এবার বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি। সাতশ' বিশ পৃষ্ঠার এই বইটির প্রকাশ কাল ১৯৯৮, প্রকাশক ঃ ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস্ লিমিটেড। লন্ডনের 'দি বাথ প্রেস' থেকে বইটি ছাপানো হয়েছে। বইটি আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তাছাড়া লেখক তাঁর এই কাজের প্রেরণা হিসাবে তাঁর জান্নাতবাসিনী মা মরিয়ম সাহেবার নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁর দোয়া নিরন্তর তার কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে বলে লেখক মন্তব্য করেছেন। বইটির শেষ অংশে প্রদত্ত তথ্য সংকেত ছাড়া বইটির অংশ ৭টি পর্বে বিভক্ত। তাছাড়াও শুরুতে রয়েছে প্রকাশকের মন্তব্য, লেখকের স্বীকৃতি-পত্র ও ভূমিকা। তথ্যসংকেতে শুধু গ্রন্থপঞ্জীর নামই নয়, তার সাথে রয়েছে পবিত্র কুরআন থেকে উল্লেখিত সূরাসমূহের আয়াত নং ও পৃষ্ঠা সংখ্যা, বিষয়-ভিত্তিক ও নাম-ভিত্তিক সংকেত, বিভিন্ন ছবি ও চরিত্র কল্পনার তালিকা ও পৃষ্ঠা সংখ্যার বিবরণী।

মূল ৭টি পর্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন বিষয়-বস্তু। যেমন, ১ম পর্বে ৫টি, ২য় পর্বে ৬টি, ৩য় পর্বে ২টি, ৪র্থ ৭টি, ৫ম পর্বে ১১টি, ৬ষ্ঠ পর্বে ৫টি এবং ৭ম পর্বে ৪টি বিষয়-বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রকাশকের মন্তব্যে কুরআন শরীফের আয়াত গণনায় **বিসমিল্লাহির রহমানির রহীমকে** আয়াত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা, আরবী শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ রীতি, কোন কোন ক্ষেত্রে আরবী মূল শব্দটি অক্ষুণ্ন রাখা যেমন, সূরা, কুরআন, মুহাম্মদ ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি, লেখকের স্বীকৃতি-পত্রে যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা হয়েছে।

এই হলো বইটির আঙ্গিক সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। আমরা আগামী সংখ্যা থেকে বইটির ভূমিকা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্যকে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এর পরে ধারাবাহিকভাবে ৭টি পর্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয়-বস্তুর কেন্দ্রীয় ভাব-ধারাকে তুলে ধরবো, ইনশাআল্লাহ্। (চলবে)

অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন
কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীন উন্নয়ন বিভাগ
বশেমুরকৃবি, সালনা, গাজীপুর।

ইস্রায়েলের রণ নীতি

ইহুদীরা নিজেদেরকে আজকাল ইস্রায়েল বলে। ইস্রায়েল তাদের গোষ্ঠী পিতা ইয়াকুবের (আঃ) সিফতি নাম। ইহুদীরা বলে ইয়াকুবের (আঃ) সঙ্গে স্বয়ং জেহুবার মল্লযুক্ত হয়েছিল। কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান। এর পর ইয়াকুবকে জেহুবা ইস্রায়েল খেতাব প্রদান করেন (আদি পুস্তক)। ইস্রায়েল অর্থ খোদার পাহ্লোয়ান। ইহুদীরা যুগে যুগে বিজাতীয়দের সঙ্গে নির্মম এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার করে আসছে। ইতিহাস এবং তাদের ধর্মগ্রন্থে ঐ সব অমানবিক ঘটনাবলী বিবৃত হয়ে আছে। তাদের শাস্ত্রের নির্দেশ হল, "প্রাণের বদলে প্রাণ ... চোখের পরিবর্তে চোখ, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত (লেবীয়, ২৪ ঃ ২০)। তাদের ধর্ম গ্রন্থের এই নির্দেশ তাদেরকে কঠোর, ক্ষমাহীনরূপে গঠন করেছে। ইহুদীরা যুদ্ধে যাবার সময় যাজক বা রব্বি এসে বলে, "হে ইস্রায়েল শুন, তোমরা অদ্য তোমাদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইতেছ; তোমাদের হৃদয় দুর্বল না হোক, ভয় করিও না, কম্পমান হইও না এবং মহা ভয়ে ভীত হইও না (দ্বিতীয় বিবরণ, ২০ঃ৩)। যুদ্ধে যাবার আগে প্রত্যেক সৈন্য বাহিনীকে রব্বি বা পুরোহিত গ্রন্থের এই বাণী পাঠ করে শুনিয়ে দেন। ফলে ইস্রায়েল সৈন্যরা বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। তাদের ধারণা যাজকের এই অভয় পাঠ তাদেরকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করবে। তারা পরাজিত হবে না। বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবে। ইহুদীদের প্রতি তাদের ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ হল, "যাদেরকে আক্রমণ করবে তাদের সবাইকে নিঃশেষ করে ফেলবে (যিহুশূয়, ১০ঃ৩৫)। এরপর বলা হয়েছে, অতীতে ইহুদীরা যখনই যুদ্ধ করেছে তখনই, "নগরের স্ত্রী-পুরুষ আবাল বৃদ্ধ এবং গরু, মেষ ও গর্দভ সব কিছুই বিনষ্ট করেছে (যিহুশূয়, ৬ঃ২১) ইস্রায়েলেরা নগরের সমস্ত দ্রব্য ও পশু লুট করল আর প্রত্যেক মানুষকে বধ করল। শ্বাস বিশিষ্ট কাহাকেও অবশিষ্ট রাখল না (ঐ, ১১ঃ১৪০)। শাস্ত্রের বিধান হল, নিঃশেষে বিনষ্ট কর, তাহার প্রতি দয়া করিও না (১ শমুয়েল, ১৫ঃ৩)"। এই নিষ্ঠুর বাণীই তাদেরকে অতি নিষ্ঠুরে পরিণত করেছে। ইহুদীরা মনে করে তারা শাস্ত্রের বিধান মেনে পুণ্য কর্ম করছে। এতে পাপতো দূরের কথা পুণ্যই সঞ্চিত হবে। ইহুদীরা নারী-পুরুষ এমন কি পশুকে বধ করেই ক্ষান্ত হয় না, তারা স্তন্যপায়ী শিশুদেরকেও হত্যা করে (ঐ, ২২ঃ১৯)। নিষ্ঠুরতার এমন নজির আর কোন ধর্ম শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। ইহুদীদের নিষ্ঠুরতা যে কত ভয়াবহ তা যেমন অতীতে গ্রন্থসমূহে কালো অক্ষরে লিখিত আছে তেমনি আজো ফেলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে ইহুদী সৈন্যরা যে অমানবিক ধ্বংস যজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে তা 'অ্যামনেষ্টির তদন্ত রিপোর্টে' চরমভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক আইন লংঘন বলা হয়েছে' (যুগান্তর, ২৪/৮/২)। ফিলিস্তিনীদের বিভিন্ন নগর ও গ্রামে যেভাবে ইহুদী সৈন্যরা ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যালীলা সংঘটিত করেছে তা নজিরবিহীন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ একজন খ্রীষ্টান হয়েও ইস্রায়েলের এই নির্মমতাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। অথচ এই ইহুদীরাই এককালে খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু যীশুকে নানাভাবে অত্যাচার করেছিল। ইহুদীদের সেই নির্মম অত্যাচারের কথা আজো ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কের কালিমায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ঐসব কাহিনী পাঠ করলে যে কোন মানুষই শিউরে উঠে ঐ সব অত্যাচারী ইহুদীদেরকে ধিক্কার দেয়। দুঃখের বিষয় আজ খ্রীষ্টানদের দু'টি প্রধান রাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র হাতে হাত মিলিয়ে অত্যাচারী ইহুদীদেরকে মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে।

মানুষ যে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না এটিও তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। ইহুদীদের অত্যাচারে মহাত্মা যীশু চীৎকার করে বলেছিলেন, 'এলি এলি লামা শবক্তানী।' আজ ফিলিস্তিনীদের হাজার কণ্ঠে এই ধ্বনী উচ্চারিত হচ্ছে। অথচ যীশুর মান্যকারীরা সেদিকে কর্ণপাত করছে না, বরং তারা ইহুদীদেরকে নানাভাবে অত্যাচারের মদদ যোগান দিচ্ছে।

- আহমদ তৌফিক চৌধুরী

সংবাদ

সন্তান লাভ

আল্লাহ্তাআলা তাঁর অশেষ ফযলে গত ০৩/০৬/২০০২ইং তারিখ রোজ সোমবার দুপুর বারটার সময় আমাদের একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এই সন্তানকে ওয়াকফে নও স্কীমে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) মঞ্জুরী দান করেছেন। নবাগত ওয়াকফে নও সন্তানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

- মোঃ নূরুল ইসলাম
মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ

শিক্ষা সপ্তাহ পালন প্রসঙ্গে

গত ২৫/৫/২০০২ তারিখ থেকে ২৮/৫/২০০২ তারিখ পর্যন্ত শিক্ষা সপ্তাহ পালন করেছি। আমরা শিক্ষা সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে নিরক্ষর ৪ জন খোদ্দামকে অক্ষর জ্ঞান দান করেছি এবং ৮ জন আতফালকে তাদের লেখা-পড়া যাতে সুন্দরভাবে হয় সে ব্যবস্থা নিয়েছি এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে লেখা পড়ার গুরুত্ব বুঝিয়েছি।

-কে, এম, নজিবুল্যাহ হুসাইন, কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঘড়িলাল

শোক সংবাদ

গত ৭ জুন শুক্রবার রাত ১১-৩০ মিনিটে আমার বড় খালাম্মা মমতাজ বেগম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাসুদেবস্থ আমাদের বাস ভবনে ইহলোক ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)।

মরহুমা নির্ভীক মোখলেস আহমদী মরহুম ফয়জুল ইসলাম হামদু ভুঞার জ্যেষ্ঠা কন্যা, ক্রোড়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট বহু ভাষাবিদ প্রখ্যাত পন্ডিত মরহুম হায়দর আলী মৌলভী সাহেবের নাতনী।

মৃত্যুকালে ৫০ বছর বয়স্ক অজাতশত্রু, নিষ্কলুষ, অত্যন্ত সহজ সরল প্রকৃতির মানুষটি নিঃসন্তান অবস্থায় ৩ ভাই, ২ বোন, বোনপুত্র, বোনঝি, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাইঝি সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

১২ এপ্রিল, ২০০০ সালে মোখালেফাতের সময় খাকসারের বাড়ি-ঘর ভাংচুর ও সর্বস্ব লুটপাটের বর্বর ও ঘৃণ্যতম দৃশ্য প্রত্যক্ষের পর থেকে মরহুমা গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে ক্রমান্বয়ে অন্তিম শয্যায় শায়িতা হন।

যিনি শৈশব থেকে মায়ের পাশাপাশি মাতৃত্বসুলভ অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন পালন করেছেন (তাকে ভাই বোনেরা সহ খাকসার 'ছোট মা' সম্বোধন করতাম), তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকে মুহ্যমান।

মহান আল্লাহ্ আমাদের শোক ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যেন শীঘ্রই সাবরে জামীল দান করেন এবং মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনাসহ তাকে করুণাময় বিধাতা যেন জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন তজ্জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট খাসভাবে দোয়া প্রার্থী।

আফজালুর রহমান রিপন (সাংবাদিক)
জেনারেল সেক্রেটারী ও নায়েম ইশায়াত
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়া

রিয়া ও এথেকে পরিত্রাণ

রিয়া কী? নিজের সাধুতা প্রদর্শন ও অপর লোকের ভক্তি আকর্ষণের জন্য নিজকে সাধু ও পরহেযগাররূপে সাজাবার বাসনাকে রিয়া বলা যেতে পারে। প্রভুত্ব প্রিয়তা ও সম্মান লিপ্সার মূল শিকড় থেকে রিয়া উৎপন্ন হয়। ইবাদতে অপরের ভক্তি ও প্রশংসার লাভের উদ্দেশ্য থাকলে উহা আল্লাহ্‌র বলে পরিগণিত হয় না। পুণ্যবান লোকদের অন্তরে রিয়া অপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি আর নেই। ইবাদত কার্যে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব মহাপাপ এবং প্রকারান্তরে ইহা শির্‌কও। ইবাদত সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌তাআলা বলেন- **ফামান কানা ইয়ারজু লেকায়া রব্বিহি ফাল-ইয়ামাল আমালান সালেহাঁওয়ালা উশরিক বি-ইবাদাতি রব্বিহি আহাদা"** অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ পেতে চায়, তার উচিত সে যেন সৎ আমল করে এবং নিজ প্রভুর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে। পবিত্র কুরআনে রিয়া সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা এসেছে, 'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য খরচ করে। তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না। এদের সাথী শয়তান এবং সাথী হিসাবে এর চেয়ে মন্দ কেউ হতে পারে না'।

হাদীসে রিয়া সম্পর্কে সাবধান বাণী

জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, "ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ)! কোন্ কার্যে নাজাত পাওয়া যায়?" তিনি (সঃ) উত্তরে বল্লেন- "রিয়া হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করলে নাজাত পাওয়া যায়"। তিনি (সঃ) আরো বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বলবেন, "হে রিয়াকারীগণ! যাদের উদ্দেশ্যে তোমরা ইবাদত করেছ তাদের নিকট গমন কর এবং তাদের নিকট থেকে তোমরা প্রতিদান চাও।"

হযরত মুআয (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা সাত আকাশ সৃষ্টি করে এক এক আকাশে এক এক ফিরিশ্‌তাকে পাহারায় নিযুক্ত করলেন। পৃথিবীতে অবস্থানকারী 'হাফাযা' ফিরিশ্‌তা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইবাদতকারীদের আমলনামা নিয়ে উর্ধ্বাকাশে রওয়ানা দেয়। প্রথম আকাশে দন্ডায়মান ফিরিশ্‌তা গীবতকারীদের আমলনামা অতিক্রম করতে বাধা দেয়। দ্বিতীয় আসমানের ফিরিশ্‌তা গর্বকারীদের, তৃতীয় আকাশের ফিরিশ্‌তা অহংকারীদের চতুর্থ আকাশের ফিরিশ্‌তা খোদপসন্দী আত্মাভিমানীদের আমলনামা অতিক্রমে বাধা প্রদান করে। পঞ্চম আকাশে ফিরিশ্‌তা ঈর্ষাকারীদের আমলনামা এবং ৬ষ্ঠ আকাশের বিদ্যমান রহমতের ফিরিশ্‌তা বাধা দেয় তাদের আমলনামাকে যারা দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্থদের সাহায্য করে নি। এরপর 'হাফাযা" ফিরিশ্‌তা অন্যান্য লোকের আমলনামা নিয়ে সপ্তম আকাশে পৌছালে সেখানকার ফিরিশ্‌তা রিয়াকারীদের আমলনামা আটকিয়ে দেয় এবং বলতে থাকে, এখানে কিছু লোকের ইবাদত রয়েছে যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা হয় নি বরং শুধু সমাজে স্বীয় প্রাধান্য ও সর্বত্র যশ প্রতিপত্তি হাসিলের উদ্দেশ্যে ছিল। তাই তাদের আমলনামা এ আকাশ ভেদ করে যাবার অনুমতি নেই। সুতরাং রিয়াকারীদের ইবাদত ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে। অতঃপর হাফাযা ফিরিশ্‌তা অবশিষ্ট ইবাদত নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে পৌছালে আল্লাহ্‌তাআলা ফিরিশ্‌তাগণকে ডেকে বলবেন, "এর মধ্যেও কিছু রিয়াকারীর ইবাদত আছে। তোমরা মানুষের বাহ্যিক অবস্থার খোঁজ রাখ মাত্র। কিন্তু আমি তাদের অন্তর দেখে থাকি। এ ইবাদত আমার জন্য করা হয় নি; অন্তরে এদের অন্য সংকল্প লুকায়িত ছিল। তাই এদের উপর আমার লা'নত!"

বিভিন্ন প্রকার রিয়া (লোক দেখানো ভাব)

আমাদের সমাজ বিভিন্ন প্রকার 'রিয়া' চোখে পড়ে। এদের মধ্যে নিম্নের কয়টি উল্লেখযোগ্য ঃ

১। **দেহ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চাল চলনে রিয়া ঃ** এ শ্রেণীর লোক দেহ শীর্ণ করে এবং চেহারা পান্ডুবর্ণ করে চুলে তেল না দিয়ে উস্‌কো খুস্‌কো করে রাখে। মানুষ এদেরকে আধ্যাত্মিক উন্নতির ধারক ও বাহক মনে করে। এরা পোশাকে বৈরাগ্যবসন ও পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রে আবৃত রাখে। কেউ কেউ সর্বদা ঠোঁট সঞ্চালন ও তসবীহ্ হাতে চলাফেরা করে।

২। **খাবারে রিয়া ঃ** এ শ্রেণীর রিয়া কোন অনুষ্ঠানে অথবা কোন গৃহে কেউ কেউ অতিথি হয়ে গেলে তারা প্রদর্শন করে থাকে। তারা তখন খাবার একদম কমিয়ে দেয় এবং দেখায় যে, তারা স্বল্পভোজী এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। অথচ নিজ বাড়ীতে এরা ভূঁড়িভোজ করে থাকে অথচ অপরের বাড়ীতে বা লোক সমাজে এরা বিপরীত করে থাকে এবং লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। এদের সম্মুখে ২/৩টি খাবারের আইটেম উপস্থিত করলে এরা তৎক্ষণাৎ বলে বসে, আহ! এত আইটেম করা হল! একটা দুটোর উপর হাত বুলিয়ে অন্যগুলো এড়িয়ে চলেন। কত বড় বুযূর্গ! এরা লোক সমাজে এক রকম খাবার খান আর নিজগৃহে এর বিপরীত কাজটি করে থাকেন।

৩। **নামাযে রিয়া ঃ** কেউ কেউ লোক সমাজে খুব সুন্দরভাবে নামায পড়ে। মাথা অবনত করে দীর্ঘ রুকূ ও সিজদাহ্ করে। সিজদায় গিয়ে আর উঠতে চায় না অথচ নিজ গৃহে একাকী যখন নামায পড়ে তখন এরা মুরগীর ঠোকর মারে। জামাতের আমীর বা কোন কর্মকর্তার আগমনের কথা জানা হলে এরা সবার অগ্রে মসজিদে চলে আসে এবং নামায পড়তে থাকেন অথচ অন্য সময়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস এরা মসজিদের দিকে মুখ ফেরান না। এরা অপরের ভক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করেন। এরূপ রিয়া নিতান্ত জঘন্য এবং এর জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এরূপ রিয়াকারী নামাযী মসজিদে জুমুআর দিন সকলের শেষে এসেও অন্যের ঘাড় টপকিয়ে প্রথম সারিতে বসে সওয়াব হাসিলের আশায় অথচ অনুসন্ধানে দেখা যাবে এরা নিজগৃহে আদৌ নামায পড়ে না। পবিত্র কুরআনে এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, দুর্ভোগ! ঐ সকল নামাযীদের জন্য যারা লোক দেখানোর জন্য (উহা আদায় করে) এবং নিজেদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন।"

এছাড়া দেখা যায় কোন কোন ইমাম লোক দেখানোর জন্য লম্বা খুতবা, দীর্ঘ সূরা পাঠ করে থাকেন। সিজদায় গিয়ে হু হু করে কাঁদতে থাকেন এবং সহজে উঠতে চান না। অপরকে দেখাবার ও শুনাবার জন্য ইমাম সাহেব অনেকসময় এরূপ করে থাকেন। অথচ একাকী নামায আদায়কালে তিনি খুবই সংক্ষেপে পড়ে থাকেন। তখন তিনি নিজ আত্মাকে কাঁদাবার সময় পান না।

৪। **মালী কুরবানী ও দান খয়রাতে রিয়া ঃ** এই শ্রেণীর লোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রবর্তিত লাযেমী চাঁদা (অবশ্য দেয় চাঁদা) মাসের পর মাস বাকী রেখে হাঙ্গামী চাঁদায় শরীক হয়ে জামাতের মধ্যে নিজেকে সকলের দৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দু করে সকলের নজরে আসতে চায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এদের সম্পর্কে বলেন, "যাহারা গয়রুল্লাহ্র জন্য খরচ করে এবং অসদুদ্দেশ্যে এবং লোকদের জন্য খরচ করে তখন ইহার ফলশ্রুতিতে তাহাদের আমল সংশোধিত হয় না বরং তাহাদের আমল মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে। এইরূপ সোসাইটিতে বাহ্যতঃ নেক কাজের উপর খরচ হইয়া থাকে কিছু দিনের পর সমগ্র সোসাইটি রিয়ার (লোক দেখানোর) শিকার হয়। ছবি উঠানোর জন্য পত্র-পত্রিকায় নাম প্রকাশের জন্য, জন সভায় সকলের সম্মুখে বড় বড় লোকদের হাতে চেক পেশ করার জন্য এবং মানুষের নিকট বাহ্বা কুড়াবার জন্য তাহারা খরচ করে। অতঃপর ইহার ফলশ্রুতিতে অপবিত্র ধন-সম্পদ অন্বেষণে তাহারা আরো অগ্রসর হয় এবং তাহাদের মধ্যে হারাম খাবার প্রবণতা পূর্বের চাইতে অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকে।"

পবিত্র কুরআনে এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- **কাল্লাযীনা ইউনফিকু মা-লাহু রিয়ায়ান্নাসি** (২ঃ২৬৫) অর্থাৎ যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে। এই সকল ব্যক্তির দান-খয়রাত জনগণের প্রশংসা অর্জনের জন্য হয়ে থাকে; আল্লাহ্র কাছ থেকে পুরস্কার প্রাপ্তির সুযোগ ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

এরূপ রিয়াকারীদের সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অন্যত্র বলেন, "বস্তুতঃ এইরূপ বড় বড় রিয়াকারী রহিয়াছে যাহারা গরীবদের জন্য খরচ করে; ইহার পশ্চাতে তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, জাতির মধ্যে তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবং জাতি যেন মনে করে তাহারা খুবই দয়ালু ব্যক্তি। এইরূপ বড় বড় রিয়াকারী রহিয়াছে যাহারা টেলিভিশনের পর্দায় স্থান পাওয়ার জন্য খরচ করিয়া থাকে। তাহাদের খরচের গতি (Motion) ভিন্ন তরফের থাকে।"

প্রদর্শনকারীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "সে-ই সৌভাগ্যশালী যে প্রদর্শন থেকে রক্ষা পায়। যে কাজই করে তা খোদার জন্য করে। প্রদর্শনকারীদের অবস্থা অদ্ভুত হয়ে থাকে, যখন খোদাতাআলার জন্য খরচ করে তখন কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করে। তবে যখন লোক দেখানোর সুযোগ পায় তখন একের স্থলে শ' খরচ করে যেখানে লোক দেখানোর সুযোগ নেই সেখানে শ' এর জায়গায় দু'চারটি খরচ করবে। এহেন ব্যাধি থেকে দোয়া করতে থাক।"

নেক বান্দাদের সন্তানগণ কেন বরবাদ হয়?

লোক দেখানো নেকীর সুদূর প্রসারী প্রভাবে অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন নেক বান্দার সন্তানগণ বরবাদ হয়ে যায়। সোসাইটিতে নিজেদের যথেষ্ট পরিচিতি দেখা গেলেও তাঁদের সন্তানগণ বিনষ্ট হয়ে যায়। জামাতের মধ্যে তাদের অবস্থান হারিয়ে যায়। তারা জামাত থেকে বহু দূরে সরে যায়। আমাদের দেশেও অনেক বুযূর্গ ব্যক্তির সন্তানগণ জামাত থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে অ-আহমদী সোসাইটিতে বিলীন হয়ে গেছে। এর গুপ্ত কারণ (Hidden Cause) হিসাবে বলা হয়ে থাকে যে, ঐ সব বুযূর্গ বা নেক বান্দাগণ লোক দেখানোর জন্য নেকী করতেন; তাই আল্লাহ্তাআলার এ দুনিয়াতে বিপরীত ক্রিয়াস্বরূপ তাদের সন্তানগণ নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন- "আপনার পুণ্য কর্মগুলো আপনার হৃদয়ে সুপ্ত থাকা উচিত। আপনি আপনার পুণ্য কর্মগুলোকে পর্দা ফেলে ঢেকে রাখবেন। কখনও আপনার পুণ্যকর্ম যেন মানুষকে দেখাবার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি না করে। যখন আপনার এরকম খেয়াল জন্মাবে তখনি আপনি মনে করবেন যে, ইহা শয়তানী প্ররোচনা।" পবিত্র কুরআনে এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- "এদের সাথী শয়তান, সাথী হিসাবে এর চেয়ে মন্দ কেউ হতে পারে না।"

রিয়াকারীকে উপরে উঠতে দেয়া হয় না ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেছেন - "যদি ত্রুটিপূর্ণ নিয়্যত হয় যে, আমি বড় কিছু হয়ে যাব, তবে আল্লাহ্ সে নিয়্যতকে পূর্ণ হতে দেবেন না, এটা নিশ্চিত। পূর্বেও কখনো হতে দেন নি ভবিষ্যতেও কখনো দিবেন না। এ বিষয়ে জামাতের যে নিরাপত্তা তা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। আল্লাহ্তাআলা উপর থেকে সবকিছু তত্ত্বাবধান করছেন এবং দেখছেন; তিনি কাউকে ভুল রাস্তা দিয়ে উপরে আসতে দিবেন না। আমাদের নিয়্যত খারাপ হতে পারে কিন্তু সর্বদ্রষ্টার দৃষ্টির বাইরে যেতে পারি না। কেননা, তিনি সর্বদ্রষ্টা। তিনি হৃদয়ের গভীর রহস্যাবলীকেও জানেন। তিনি দেখছেন, এ জামাতের লোকেরা কে কি করতে চাচ্ছে, তারা কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর অবশেষে আল্লাহ্ তাদের নীচে ফেলেন।"

আল্লাহ্র দিকে ভ্রমণকারী সবার জন্য একটি উপদেশ ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ "উক্ত অবস্থায় (অর্থাৎ নির্জনবাস) তিনি (সঃ) ততোদিন থাকেন যতদিন তাঁকে উক্ত অবস্থায় রাখতে চেয়েছিলেন"। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এ সম্পর্কে বলেন- "আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশী প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন আঁ হযরত (সঃ)-এর এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং তা দৃষ্টিগোচর রেখে নিজের অবস্থা যাচাই করে যে, কতটুকু সে আল্লাহ্র নৈকট্যে এগোয় বা এগোবার প্রয়াস পায়। একটি হাদীসে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, তিনি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসেন যে কিনা পরহেযগার

(সৎ-সাধু) হয় থাকে, যে বে-নিয়ায এবং অখ্যাত ও নিভৃতচারী জীবন যাপনকারী হয়ে থাকে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্র এটা চিরায়ত রীতিনীতি, যারা একটা কিছু বনবার (হবার) আকাঙ্ক্ষা করে তারা বঞ্চিত থাকে এবং যারা লুকোতে চায় তাদেরকে তিনি বাইরে বের করেন এবং সব কিছু বানিয়ে দেন।" তিনি (আঃ) আরও বলেন ঃ "ম্যাঁ থা গরীব ও বেকাস গুমনাম ও বেহুনার / কোই না জানতা থা কেহ হ্যায় কাদিয়াঁ কিধার।" (আমি ছিলাম গরীব, নিরুপায় অখ্যাত ও অযোগ্য অক্ষম / কেউ জানতোও না কাদিয়ান আছে কোথায়) উপরোক্ত উপদেশাবলী স্মরণ রেখে মানুষ চলাফেরা করলে আশা করা যায় তার দ্বারা লোক দেখানো ভাব (রিয়া) হ্রাস পাবে। আত্ম প্রচারের জন্য কোন মিডিয়ার প্রয়োজন হবে না। ছিঁড়া কাঁথায় শায়িত থাকলেও আল্লাহ্ একদিন তার প্রতি দৃষ্টি দেবেন। শুধু মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারলে তাঁর বিকাশ একদিন প্রকাশ পাবে। সমাজের লোকদের সন্তুষ্টি নয় বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি একমাত্র পথ যা মানুষ তার মহান প্রভুর সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম।

লাঞ্ছনা সইতে রাজী কিন্তু রিয়া (লোক দেখানো) কর্ম থেকে রক্ষা পেতে চাই ঃ

এক বুযূর্গ মৌলভী তাঁর নিজ প্রয়োজনে কিছু টাকার জন্য ওয়াজ নসীহত শুরু করেন এতে মুগ্ধ হয়ে এক বান্দা সেই মহফিলে ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা দান করে। তখন উক্ত মৌলভী প্রকাশ্যে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা শুরু করেন। দানকারী ব্যক্তি শয়তানের ধোঁকা খাবার আশংকায় ঐ টাকা ফেরৎ নিল। উপস্থিত জনতা তার এ কান্ড দেখে তাকে গালাগালি শুরু করে দিল। মৌলভী সাহেব ওয়াজ শেষে গৃহে ফিরলে মধ্যরাতে ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐ দশ হাজার টাকা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। এবং মৌলভী সাহেবকে উক্ত টাকার কথা মরণের আগ পর্যন্ত কাউকে না বলার জন্য আরজ করল। এ কথা শুনে মৌলভী সাহেব কাঁদতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন, "এলাকার লোকজন তো সকলেই জানে, তুমি আমার কাছ থেকে তোমার দান করা টাকা ফেরৎ নিয়ে গেছ; তারা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তোমাকে লাঞ্ছনা করবে; গাল মন্দ দিবে।" প্রত্যুত্তরে দানকারী ব্যক্তি বললো, আমি সারা জীবন লাঞ্ছনা সইতে রাজী কিন্তু রিয়া বা লোক দেখানো কর্ম থেকে রক্ষা পেতে চাই।"

স্থান বিশেষে ইবাদত প্রকাশ করার বিধান ঃ

ইবাদত গোপন রাখলে রিয়ার আপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বুখারী শরীফে রিয়াকারী সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ "যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্তাআলা কিয়ামতের দিন তার গোপন দোষ প্রকাশ করে দেবেন।" তবে অনেক সময় ইবাদত তথা পুণ্যকর্ম প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। ইবাদত প্রকাশ করলে সর্বাপেক্ষা বড় উপকার অপর লোকে ইবাদতকারীর অনুসরণ করবে এবং জগতে অধিক পরিমাণ ইবাদতের প্রচলন হবে। এ কারণে আল্লাহ্তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ "তোমরা যদি প্রকাশ করে সদকাসমূহ প্রদান কর তথাপি ভাল কথা কিন্তু যদি গোপনে কর তবে উহা তোমাদের জন্য উত্তম।" হাদীসে এর সমর্থন রয়েছে "একদা রসূল করীম (সঃ) কিছু অর্থ চাইলে এক আনসারী এক থলিপূর্ণ অর্থ নিয়ে আগমন করলেন; ইহা দেখে অপর লোকেও অর্থ আনতে আরম্ভ করল। তখন আঁ হযরত (সঃ) বললেন- 'যে ব্যক্তি কোন সৎপ্রথা প্রচলন করে এবং লোকে (ইহা দেখে) তার অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি নিজ কার্যের সওয়াব তো পাবেই তদুপরি অপর লোকে তার অনুসরণ করে যে সওয়াব পাবে সে পরিমাণ সওয়াবও সে লাভ করবে।"

রিয়া ব্যাধির প্রতিকার ঃ

আগেই বলা হয়েছে প্রভুত্ব-প্রিয়তা ও সম্মান লিপ্সার মূল শিকড় থেকে রিয়া উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ আবার প্রশংসা-প্রীতি, নিন্দা-ভীতি এবং পর-প্রত্যাশী হওয়া থেকে রিয়ার উদ্ভব মনে করে থাকেন। তাই প্রশংসা-প্রীতিকে অন্তর হতে মুছে ফেলতে হবে। আল্লাহ্র ভালবাসার উপর মানুষের ভালবাসাকে পরিহার করার দৃঢ় মনোবল কায়েম করতে হবে। অপরের মনস্তুষ্টির জন্য এই নশ্বর জগতে নিজকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত রাখা এবং প্রশংসা লাভের হীনপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে নিজকে পরকালের কঠিন আযাবে নিপতিত করা নিতান্ত মূর্খতা। এই প্রকার জ্ঞান ও চিন্তা হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখা কর্তব্য।

নিন্দা-ভীতির কারণেও রিয়ার উদ্ভব ঘটে থাকে; তাই নিন্দাভীতি থেকে আত্মরক্ষা প্রয়োজন। নিন্দা-ভীতি বিদূরীত করতে হলে সর্বদা নিজকে সম্বোধন করে বলতে হবে ঃ "আমি আল্লাহ্র নিকট সৎ ও প্রশংসিত হতে পারলে লোকের নিন্দায় আমার বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্র নিকট আমি ঘৃণিত ও অপমাণিত হলে সকল লোকের প্রশংসায়ও আমার কোন লাভ নেই।"

এছাড়া পর-প্রত্যাশী তথা অপরের নিকট থেকে কিছু প্রত্যাশার উদ্দেশ্যে মানুষ রিয়া করে থাকে। অপরের নিকট থেকে কিছু পাওয়ার লোভ অপসারণ করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, অপরের নিকট আমরা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পেতেও পারি অথবা নাও পারি। এজন্য হয়তো আমাদেরকে অপমান-লাঞ্ছনা ভোগের সম্মুখীন হতে হবে। তাই অপরের নিকট হতে কিছু প্রাপ্তি-লাভ বিদূরীত করার সাধনা করতে হবে।

পরিশেষে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই এ প্রবন্ধটি শেষ করছি ঃ

"প্রত্যেক শুভ্রতাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখবে না, কারণ কতক কালো কতক সাদার চেয়েও ভাল হয়ে থাকে যেমন ঃ কালো চুল যৌবনের শক্তির প্রতীক এবং সাদাচুল দুর্বল, ক্ষীণ ও বার্ধক্যের পরিচয় বহন করে থাকে। অনুরূপভাবে লোক দেখানো উজ্জ্বল পুণ্যের প্রদর্শনী মূল্যহীন। এর চেয়ে সোজা ও সরল পাপী ব্যক্তিও ভাল যারা প্রতারণা করে নিজেদের পাপকে লুকিয়ে রাখে না।"

- অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ পালনকারীদের জন্যে দোয়া

♦ হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ দোয়া হাজাত সম্বন্ধে বর্ণনা করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ ،وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ-

(مستدرک حاکم مطبوعہ بیروت جلد ا ص ۴۴۱)

(আল্লাহুম্মাগ ফিরলিল হাজ্জি, ওয়া লিমানিস্ তাগফারা লাহুল হাজ্জ-মুস্তাদরাক হাকেম, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪১, বৈরুতে মুদ্রিত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! হাজীদেরকে ক্ষমা করো আর তাদেরকেও যারা হাজীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

বায়তুল্লাহ্ থেকে ফিরে এসে দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (স্বল্পেতুষ্ট ও রিয্‌কে বরকতের) এ দোয়া নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম করতেন। হযরত সা'দ বিন জাবীরের দৃষ্টিতে বায়তুল্লাহ্ থেকে বিদায় নেবার সময় এ দোয়া পড়া সমীচীন ঃ

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِیْ بِمَا رَزَقْتَنِیْ وَ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاخْلُفْ عَلٰی كُلِّ غَائِبَةٍ لِّیْ بِخَیْرٍ-

(مستدرک حاکم مطبوعہ بیروت کتاب التفسیر جلد ۲ صفحہ ۳۵۶)

(আল্লাহুম্মা কৃন্নি'নী বিমা রযাকৃতানী ওয়া বারিক লী ফীহি ওয়াখলুফ 'আলা কুল্লি গাইবাতিল্লী বিখয়রিন-মুসতাদরাক হাকেম কিতাবুত তফসীর, বৈরুতে ছাপা, ২ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৬)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! যা তুমি আমাকে দান করেছো তার ওপরে আমাকে তুষ্ট-তৃপ্ত করে দাও আর এতে আমার জন্যে বরকত ও কল্যাণ বর্ষণ করো আর যে বস্তু আমি লাভ করি নি তাতে আমার জন্যে উত্তম বদলা দাও।

খাবার খাওয়ার সময়ে দোয়া

♦ হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) খুদরী থেকে বর্ণিত। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন খাবার খেতেন ও পানি পান করতেন তখন এ দোয়া পড়তেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مُسْلِمِیْنَ-

(ترمذی کتاب الدعوات)

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমানাওয়া সাক্বানা ওয়া জা'আলানা মুসলিমীন- তিরমিযী কিতাবুদ্ দাওয়াত)।

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্যে যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন আর আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।

♦ হযরত আবূ আয়্যুব (রাঃ) আনসারী বলেন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন খাবার খেতেন ও পানি পান করতেন তখন এ দোয়া পড়তেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَ وَ سَقٰی وَ سَوَّغَهٗ وَ جَعَلَ لَهٗ مَخْرَجًا-

(ابوداؤد کتاب الاطعمہ)

(আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্ব 'আমা ওয়াসাক্বা ওয়া সাওওয়াগাহূ ওয়া জা'আলা লাহূ মাখরজান আবূ দাউদ, কিতাবুল্ আত্ব'আমাহ্)।

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্যে যিনি খাবার খাইয়েছেন ও পানি পান করিয়েছেন আর উহা গলা থেকে নামিয়েছেন আর উহা বের করার রাস্তাও বানিয়েছেন।

♦ হযরত আবূ আমামাহ্ বাহিলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সামনে খাবার দস্তর খান উঠানো হতো তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِیْرًا طَیِّبًا مُّبَارَكًا فِیْهِ،اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَفَانَا وَ آوَانَا ،لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا غَیْرَ مَكْفِیٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مَكْفُوْرٍ وَّلَا مُسْتَغْنًی عَنْهُ رَبَّنَا-

(یہ دعا بخاری اور ترمذی کتاب الاطعمہ کی روایت کو یکجا کر کے پیش کی گئی ہے)

(আল্‌হামদুলিল্লাহি কাসীরান ত্বায়্যিবান মুবারাকান ফীহি- আল্‌হামদুলিল্লাহিল্লাযী কাফানা ওয়া আওয়ানা লাকাল হামদু রব্বানা গয়রা মাকফিয়্যিঁওয়ালা মুওয়াদ্দাইঁওয়ালা মাকফুরিঁওয়ালা মুসতাগনান 'আনহু রব্বানা- এ দোয়া বুখারী ও তিরমিযী কিতাবুল্ আত্ব'আমাহ্‌র বর্ণনাকে এক স্থানে করে উপস্থাপন করা হয়েছে)।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। অনেক অনেক পবিত্রতা ও কল্যাণমন্ডিত প্রশংসা। সকল প্রশংসার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আর যিনি আমাদেরকে তাঁর আশ্রয়ে রেখেছেন। হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমিই খাবার খাইয়ে থাকো আর আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তোমাকে খাওয়ানো হয় না। আর তোমার কাছ থেকে চাওয়া ও প্রত্যাশা করাকে পরিত্যাগ করা যায় না। তোমার দেয়া খাবারের অকৃতজ্ঞতা করা যায় না। আর হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক। তোমার নিকট ছাড়া অভাবমুক্ত হওয়া যায় না।

হযরত মুআয (রাঃ) বিন আনাস বলেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি খাবার খেয়ে এ দোয়া পড়ে আল্লাহ্‌তাআলা তার পাপ ক্ষমা করে দেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنِیْ هٰذَا الطَّعَامَ وَ رَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَلَا قُوَّةٍ -

(ابوداؤد کتاب اللباس)

(আল্‌হামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্বআমানী হাযাত্ত্বা' - আমা ওয়া রযাক্বনীহি মিন গয়রি হাওলিম্মিন্নী ওয়া লা কুওওয়াতিন-আবূ দাউদ, কিতাবুল্ লিবাস)।

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্যে যিনি আমাকে এ খাবার খাইয়েছেন আর আমাকে কোন শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই এ রিয্‌ক দিয়েছেন।

কারও বাড়ীতে খাবার খেয়ে দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমাকে আর খালিদ বিন ওয়ালীদকে রসূলে করীম (সঃ) ঘরে নিয়ে গিয়ে দুধ পান করালেন আর বল্লেন, যখন আল্লাহ্ খাবার দান করেন তখন এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیْهِ وَ اَطْعِمْنَا خَیْرًا مِّنْهُ -

(ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া আত্ব'ইমনা খয়রাম্মিনহু-তিরমিযী, কিতাবুদ্‌দাওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্যে এ খাবারের মধ্যে বরকত ও কল্যাণ বর্ষণ করো আর আমাদেরকে এথেকে উত্তম দান করো।

দুধ পান করে দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদের দুধ খাইয়ে বল্লেন, যাকে আল্লাহ্ দুধ পান করান সে এ দোয়া পাঠ করুক ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ - (ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদ্‌না মিনহু - তিরমিযী, কিতাবুদ্‌দাওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্যে এতে বরকত ও কল্যাণ বর্ষণ করো আর এতে আমাদেরকে বাড়িয়ে দাও। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

ফুলের তোড়া

(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

মূল ঃ আমাতুল বারী নাসের ও বুশরা দাউদ

(১৩ম কিস্তি)

ঈদের নামায

ঈদ হলো দু'টি। একটি ঈদ রমযানের রোযা শেষ হওয়ার পরে ১লা শওয়াল তারিখে আর দ্বিতীয় ঈদ হলো যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে। ঈদের নামাযে আযান হয় না আর একামতও না। এ উভয় নামায পড়ার ওয়াক্ত সূর্য ওপরে ওঠার পরে আরম্ভ হয়। প্রথম ঈদের নাম **ঈদুল ফিতর** আর দ্বিতীয়টির নাম **ঈদুল আযহিয়া**। প্রত্যেক নামাযেই সশব্দে কুরআনের অংশ বিশেষ পাঠ করা হয়ে থাকে।

ঈদের নামাযের পদ্ধতি

প্রত্যেক ঈদের নামাযই একই পদ্ধতিতে পড়া হয়ে থাকে। দু' রাকা'আত নামায পড়ে জুমুআর খুতবার ন্যায় ইমাম খুতবা পড়েন। খুতবার মধ্যে সময়োপযোগী বিষয় সম্বন্ধে বলা হয়। প্রথম রাকা'আতে নিয়্যত বেঁধে অন্য নামাযের ন্যায় প্রথমে সানা পড়া হয় আর এর পরে হাত তুলে সাত বার তকবীর **আল্লাহু আকবর** (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলা হয়। উভয় হাত কান পর্যন্ত বা কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে আবার ছেড়ে দেয়া হয়। হাত বাঁধাও বৈধ। তকবীরের পরে হাত বেঁধে কুরআনের কোন সূরা বা অংশ বিশেষ পড়া হয় আর দ্বিতীয় রাকা'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৫টি তকবীর দিতে হয়। প্রত্যেক রাকা'আতে নির্ধারিত তকবীর ছাড়া ১২ তকবীর অধিক দিতে হবে।

ঈদের নামাযের স্থানে এক রাস্তা ধরে যাওয়া ও অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা সুন্নত কর্তৃক সমর্থিত। বৃষ্টির দরুন ঈদগাহে যদি ঈদের নামায না পড়া যায় তাহলে মসজিদে অথবা পরের দিনও এ নামায পড়া যেতে পারে। ঈদের খুতবা নামাযের পরে হয়ে থাকে।

ঈদের দিন একজন আর একজনের সাথে সাক্ষাৎ করলে এ দোয়া পড়তে হয় **তাক্বব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা** (আল্লাহ্ তোমার কাছ থেকেও ও আমার কাছ থেকেও গ্রহণ করুন - অনুবাদক)

ঈদের দিনগুলোতে বেশি বেশি করে এ তকবীর পড়তে হয় ঃ

আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা তাঁরই।

হযরত উসমান গনী (রাঃ)

মক্কার গলিতে এক সাথে খেলাধূলা করে যুবক হয়ে যাওয়া বন্ধুদের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে হযরত উসমানের নামও এসে যায়। মক্কার রীতি ছিলো, পিতার নাম পুত্রের নামের সাথে শামেল করে নেয়া হতো। হযরত উসমান (রাঃ)-এর পিতার নাম ছিলো আফ্ফান। এজন্যে তিনি উসমান বিন আফ্ফান নামে বিখ্যাত। তিনি (রাঃ) বয়সে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ৬ বছরের ছোট ছিলেন। তিনিও কুরায়েশ গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন যেভাবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ছিলেন।

ঐ যুগে শিক্ষার রীতি এভাবে ছিলো না যেভাবে আজকাল সব শিশুই স্কুলে যায়। বরং শিক্ষকের ঘরে গিয়ে জ্ঞান লাভ করতে হতো। হযরত উসমান (রাঃ) শিক্ষা লাভ করেন। আরব গোত্রগুলো অধিকাংশই ঘুরে ফিরে রোজিরোজগারে অভ্যস্থ ছিলো। এজন্যে তাদের বেশি লক্ষ্য থাকতো ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি। ব্যবসার অর্থ একস্থান থেকে সস্তায় জিনিস-পত্র কিনে যখন অন্য শহরে গিয়ে অধিক মূল্য পাওয়া যায় তা বিক্রী করা আর সেখান থেকে ঐসব জিনিষ যা সস্তায় পাওয়া যায় কিনে নিয়ে এসে নিজের শহরে ওগুলোর প্রয়োজন হলে বেঁচে দেয়া। এভাবে অনেক লাভ হতো। অধিকাংশ লোক এ কাজই করতো। আজকালের মত গাড়ী ইত্যাদি তখন ছিলো না। বিমানও ছিলো না। উটের পিঠে মাল বোঝাই করে নিয়ে যেতো। সারা দিন ভ্রমণ করতো। আর কোন স্থানে যেখানে রাত হতো সেখানে রাত কাটিয়ে দিতো। তাদের সাথে তাবু থাকতো। খুব তাড়াতাড়ি তা একটি ছোট বাড়ীর মত করে টানিয়ে নিয়ে থাকতো। উটও বিশ্রাম করে নিতো। আর উটের ওপরে যে বসতো সে-ও। পরের দিন অতি ভোর বেলায় এক ব্যক্তি ঘন্টা বাজাতো যার অর্থ হতো যে, এখন সামনে রওয়ানা দেবো, শীঘ্র তৈরী হয়ে নাও। হযরত উসমান (রাঃ) যাঁর কথা আপনাদেরকে বলা হচ্ছে, লেখা-পড়া জানতেন। কিন্তু অধিক মনোযোগ দিতেন তাঁর পিতার ব্যবসায়ের প্রতি। তিনি গমের ব্যবসায় করতেন। তিনি খুবই ঈমানদার ও পরিশ্রমী ছিলেন। আল্লাহ্ পাক পরিশ্রমী লোককে ভালবাসেন। এজন্যে তিনি (রাঃ) অনেক লাভবান হতেন। তাঁর নিকট অনেক ধন-সম্পদ জমা হয়ে গেলো। আর সব লোক জানতো হযরত উসমান (রাঃ) একজন বড় ধনী। ধনী তো ছিলেন, কিন্তু কোমল অন্তরের অধিকারীও ছিলেন। গরীবদের খুব সাহায্য করতেন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে লোকদের মধ্যে কিছু কিছু বদ-অভ্যাস ছিলো। যা আয় করতো মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে উড়িয়ে দিতো। জুয়া এমন এক রকমের খেলা যাতে শর্ত লাগানো হয় যে, জিতলে পুরস্কার লাভ হবে এবং পরাজিত ব্যক্তিকে টাকা ফেরৎ দেয়া হয় না। এমন আরও কয়েকটি খারাপ স্বভাব ছিলো তাদের। কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ) মদ খেতেন না আর জুয়াও খেলতেন না। বেহুদা সময় নষ্ট করে এমন কথা-বার্তাও বলতেন না। এভাবে তাঁর সম্পদ নষ্ট হতো না। যখন তাঁর বয়স ৩৩ বছর হলো তখন একদিন তাঁর বন্ধু হযরত আবূ বকর (রাঃ) একদিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি একেবারে একটি নতুন কথা শুনালেন।

হযরত আবূ বকর বল্লেন, আমরা তো বলাবলি করতাম যে, পাথরের মূর্তি খোদা হ'তে পারে না। কিন্তু আমরা জানতাম না যে, খোদা কে? আস আমি তোমাকে বলবো। আমাকে আমার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন। তিনি বলেছেন, এসব পাথর দ্বারা তৈরী মূর্তি। আমাদেরকে কিছুই দিতে পারে না। খোদা এক-অদ্বিতীয় তিনিই সকলের স্রষ্টা ও মালিক। তিনিই (আল্লাহ্) মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বাণী দিয়েছেন সারা বিশ্বকে ঐকথা জানিয়ে দিতে। আর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা আমি সত্য বলে মেনে নিয়েছি। তার নতুন ধর্মের নাম ইসলাম। হযরত উসমান (রাঃ) গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন, পরে অস্থির হয়ে এখনই মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে যেতে বল্লেন। আমি তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবো। হযরত আবূ বকর ইহা শুনে খুবই খুশী হলেন। কেননা, তখন পর্যন্ত তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ ইসলাম করে

নি। সত্বর যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু কী দেখতে পেলেন! আল্লাহ্‌র প্রিয় নবীর সাথে দেখা করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন অথচ তিনি নিজেই চলে এসেছেন। তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-কে দেখে বল্লেন, উসমান! আমি তোমার সামনে বেহেশ্‌তকে উপস্থাপন করছি? যদি চাও তো একে গ্রহণ করে নাও। আমি খোদার রসূল। আর আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে তোমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় রাস্তার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঠিয়েছেন। আমার সাথী হলে এতে তোমাদের কল্যাণ হবে। যদি অস্বীকার করো তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হযরত উসমান (রাঃ) সাথে সাথে বললেন, আপনার বর্ণনাকৃত জান্নাতের আমার খুব আকাঙ্ক্ষা। আমাকে ইসলামের কলেমা পড়ান আর ইসলামের আরকান (নিয়ম-কানুন) শিখান। আমি ঈমান আনছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র সত্যবাদী রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

তাঁর (রাঃ) পরিবারের লোকেরা যখন জানতে পারলো, যে ব্যক্তিকে গোটা শহরের লোক ভুল বলে, হযরত উসমান (রাঃ) তাঁকে মেনে নিয়েছেন তখন তারা খুবই রাগান্বিত হলো। তাঁর চাচা হাকিম বিন আবী 'আসল জানতে পারলে খুব রাগান্বিত হয়ে আসলো আর এতো বয়স্ক লোককে ধরে একটি গাছের সাথে দাঁড় করিয়ে রশি দ্বারা খুব শক্ত করে বেঁধে ফেল্লো এবং লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো। মারতে মারতে বলতে ছিলো, মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর খোদাকে মানতে পারবে না। কিন্তু মার খাওয়া সত্বেও খোদার প্রতি ভালবাসা আরও অধিক হয়ে গেলো। হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চেহারার জ্যোতিঃ ও তাঁর স্নেহমাখা কথাগুলো বলার ভঙ্গী সব কিছু মনে জাগরিত হতে লাগলো আর মার-পিটের কষ্ট কম হতে লাগলো।

গাছের সাথে বাঁধা মার খাওয়া লোকটি কুরায়েশ গোত্রের বনী উম্মীয়া শাখার সাথে সম্পর্ক রাখতেন। এর মধ্যে পরে ইসলামের প্রত্যাশী লোকের জন্ম হয়েছিলো। এবং প্রায় ১০০ বছর ধরে তারা শাসন কার্য পরিচালনা করেছিলো। কেবল মারপিটই নয় কয়েক প্রকার কষ্ট দেয়া হয়েছিলো। তখনও বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে নি। মুসলমানরা সন্ধ্যাকালে সাক্ষাৎ করলে প্রত্যেকেই তাঁর ওপরে কৃত যুলুম-অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতেন। এত কঠিন দুঃখ-কষ্ট দেখে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত দিলেন যেন মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে চলে যায়।

আল্লাহ্‌তাআলার বাণী অর্থাৎ তাঁকে (সঃ) ইসলাম শেখাতে এর মধ্যে ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা খুবই কম ছিলো। যারা গ্রহণ করেছিলেন তাদের ভীষণ কষ্ট দেয়া হচ্ছিলো। হযরত উসমান (রাঃ)-এর মত প্রিয় লোককে আল্লাহ্ পাক এক বিরাট কল্যাণ দিলেন। হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এক কন্যার সাথে তাঁর বিয়ে হলো। এ কন্যা ছিলেন আমাদের প্রিয় রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদরের কন্যা হযরত রুক্‌কাইয়া। হযরত উসমান খুবই সুখী ছিলেন। কিন্তু কষ্ট অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিলো। বিপদ-আপদ বেড়ে গিয়েছিলো। একদিন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজের সাথীদের পরামর্শ দিলেন। তিনি (সঃ) তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করেন আর বলেন, এদিকে একটি দেশ আছে যেখানে কারও ওপরে কোন অত্যাচার হয় না। তোমরা সেখানে চলে যাও। ঐ দেশের নাম হাবশা বা আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়াও বলা হয়)। এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়াকে 'হিজরত' বলে। হুযূর (সঃ)-এর সাথীদের এ সফরকে আবিসিনিয়ার হিজরত বলে। কাফিররা যখন জানতে পারলো যে, মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে চলে গেছে। তখন তারা তাঁদের পিছু নিলো। কিন্তু ধরতে পারে নি। সুতরাং এসব লোক নৌকায় চড়ে আবিসিনিয়া চলে যায়। হযরত উসমান (রাঃ) এ হিজরতে তাঁর বাড়ী-ঘর নিজের টাকা-পয়সা তাঁর উট-বকরী সব কিছু মক্কায় ছেড়ে যান। এভাবে কেবল খোদাতাআলাকে এক-অদ্বিতীয় মান্য করার পরে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও মালামাল প্রভৃতি সব কিছু ছেড়ে, নিজের দেশ ছেড়ে আবিসিনিয়ায় যেতে হয়। তাঁর সাথে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা ছিলেন।

কিছুদিন পর হযরত উসমান (রাঃ) মক্কায় চলে আসেন। মক্কার অবস্থা পুরোপুরি ঠিক হয় নি। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সারা মুসলমানের সাথে মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। এভাবে হযরত উসমান (রাঃ) আর একবার নিজের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে মদীনায় এসে পড়েন। মদীনায় এতটা দুঃখ-কষ্ট তো ছিলো না মক্কায় যেমনটা ছিলো। কিন্তু এখানে কতকগুলো গোত্র দুষ্টামি করছিলো। ঐসব দিনে কূঁয়ো থেকে পানি তুলতে হতো। সারাটা মদীনাবাসীর পানীয় জলের জন্যে একটি মাত্র কূঁয়ো ছিলো। আর এ কূঁয়ো ছিলো এক ইহুদীর। ইহুদী জানতো যে, এখান থেকেই সবাই পানি ব্যবহার করবে। এজন্যে সে অনেক অর্থের বিনিময়ে পানি দিতো। ধনীদের তো কোন কষ্ট হতো না। তারা কিনে নিতো। কিন্তু হতভাগা গরীবরা কীভাবে পানীয় পানি কিনতো? আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম গরীবদের খুব ভালবাসতেন। তিনি (সঃ) এ কষ্ট দেখলেন। তখন একদিন বল্লেন, যদি কোন মুসলমান এ ইহুদী থেকে কূঁয়োটা কিনে নেয় আর নিজের মুসলমান ভাইদেরকে এথেকে পানি নিতে দেয় তাহলে আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি।

হযরত উসমান (রাঃ) ইহা শুনে উঠলেন আর কূঁয়োর ইহুদী মালিকের নিকট গেলেন, বল্লেন, তুমি এ কূঁয়ো কত দামে বিক্রী করবে? ইহুদী মনে করলো, এ মুসলমান হিজরত করে এসেছে কী করেই বা কূঁয়ো কিনবে? সে অনেক মূল্য বলে দিলো। হযরত উসমান (রাঃ) ঐ সময়েই ঐ মূল্য আদায় করে দিলেন আর ঘোষণা করে দিলেন, মুসলমান এথেকে বিনামূল্যে যত চায় পানি ব্যবহার করতে পারে।

একবার খুবই দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। দুর্ভিক্ষ অর্থ হলো খাবার ও পান করার সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়া। তাঁর (রাঃ) উট বোঝাই গম আসলে এর ওপরে দশগুণ লাভ হতো। কিন্তু তিনি সব তরি-তরকারি খোদাকে খুশী করার জন্যে গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আমরা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, হযরত উসমান (রাঃ) ব্যবসায় করতেন। যখন মুসলমান হয়ে গেলেন তখন তিনি মনে করলেন যে, এখন আমার সব কিছুর মালিক খোদাতাআলা। খোদাতাআলার মালিক হওয়ার অর্থ এই যে, এমন কাজে ব্যয় করবো যাতে খোদা খুশী হন। তিনি ব্যবসায় অর্থ খাটাতেন তো মনে করতেন যে, খোদার অর্থ ব্যবসায় খাটাচ্ছেন। আর যখন লাভ হতো তখন মনে করতেন খোদার অর্থে লাভ হয়েছে। তিনি খোদার রাস্তায় এমন সব কাজে ব্যয় করতেন যাতে খোদা সন্তুষ্ট হন। একবার এমন হলো যে, মুসলমানদের মসজিদ যাকে মসজিদে নববী বলা হয় সংকীর্ণ মনে হতে লাগলো। নামাযীরা বেশি আসতে লাগলেন। জায়গা কম হয়ে গেলো। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলছিলেন যে, মসজিদের সাথে কিছু জমি খালি পড়ে আছে। যদি কোন ব্যক্তি ইহা কিনে মসজিদের জন্যে দান করে দেয় তাহলে মসজিদ বড় হতে পারে।

হযরত উসমান (রাঃ) ঐ জায়গা কিনে মসজিদ বড় করার জন্যে হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে তোহ্‌ফা দিয়ে দিলেন। উন্মুক্ত হস্তে দানকারীকে গনী বলা হয়। এজন্যে তিনি উসমান গনী নামে খ্যাত। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

পরিপূর্ণ আন্তরিক ও বিশ্বস্ত খান সাহেব হযরত মুন্সী অরোড়ে খান (রাঃ) আহমদী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতার প্রেম ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

মূল ঃ মকসুদ আহমদ মুনীর, মুরব্বী সিলসিলা আহমদীয়া

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে আন্তরিকতা ও ভালবাসার এক ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) মুন্সী সাহেবের আন্তরিকতা ও ভালবাসার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন, "আমার পক্ষে ঐ দৃশ্য ভোলা সম্ভব নয় এবং কখনও ভুলবো না যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওফাতের মাত্র কয়েক মাস গত হয়েছে। একদিন বাইরে থেকে কেউ শব্দ করে আমাকে ডাকলো। কাজের লোক কিম্বা বাচ্চারা কেউ বল্‌লো, দরজায় একজন দাঁড়িয়ে আছেন আর তিনি আপনাকে ডাকছেন। আমি বাইরে এসে দেখলাম মুন্সী অরোড়ে খান সাহেব মরহুম দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মুসাফাহা করলেন। তারপর তিনি নিজের পকেটে হাত দিলেন। যতদূর মনে হয় তিনি পকেট থেকে দু' কিম্বা তিন পাউন্ড বার করলেন। আমাকে বললেন, এটা আম্মাজানকে দিয়ে দেবেন। এ বলার সাথে সাথে তার ওপর এরূপ ভাবাবেগ সৃষ্টি হল যে, তিনি চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর কাঁদার অবস্থা এরূপ ছিল যে, মনে হচ্ছিল যে, ছাগল জবাই করা হচ্ছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, ইনি কেন কাঁদছেন। কিন্তু আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আর অপেক্ষা করতে থাকলাম যে, আসলে তাঁর কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করবো। এরূপভাবে কয়েক মিনিট কাঁদতে থাকেন। মুন্সী অরোড়ে খান সাহেব মরহুম খুব সামান্য চাকুরি থেকে উন্নতি করেন। প্রথমে কোর্টে চাপরাশির কাজ করতেন। পরে নিম্নমানের করণিকের পদ পান এবং পরে ড্রাফটস্‌ম্যানে পদোন্নতি পেয়ে সিরিস্তাদার হন। এরপর নায়েব তহশীলদার সবশেষে তহশীলদার হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম তাঁর বেতন ১০/১৫ টাকার বেশি ছিল না। যখন তিনি কিছু শান্ত হলেন তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বলেন, আমি গরীব লোক ছিলাম। যখনই ছুটি পেতাম কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতাম। সফরে বেশির ভাগ অংশ হেঁটে আসতাম যেন সিলসিলার খেদমতের জন্য কিছু পয়সা বেঁচে যায়। তবুও দেড় / দু'শ টাকা খরচ হয়ে যেত। এখানে এসে যখন আমি ধনীদের দেখতাম, তাঁরা সিলসিলার খেদমতের জন্য অনেক টাকা খরচ করছে তখন আমার ইচ্ছা হ'ল যদি আমার কাছে থাকতো আর আমি মসীহ্ মাওউদ মাহদী মাহূদের খেদমতে রূপার উপহারের পরিবর্তে সোনার উপহার পেশ করতে পারতাম। শেষে আমার মাহিনা বাড়ল (এ সময় সম্ভবতঃ ২০/২৫ টাকা পর্যন্ত পৌছেছিল) আর আমি প্রতি মাসে কিছু টাকা জমা করতে শুরু করি। আমি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, এ টাকা যখন এত পরিমাণ পৌছাবে, যেমন আমি চাই, তখন আমি তা পাউন্ডে রূপান্তর করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে পেশ করবো। আরও বলেন, যখন আমার কাছে এক পাউন্ডের সমান টাকা জমলো তখন টাকা দিয়ে এক পাউন্ড নিয়ে নিলাম। তখন দ্বিতীয় পাউন্ডের জন্য টাকা জমাতে শুরু করি। যখন কিছুদিন পর টাকা জমা হল দ্বিতীয় পাউন্ড নিলাম। এরূপে আমি কিছু কিছু টাকা জমিয়ে পাউন্ডে রূপান্তর করতে থাকি। আমার এ উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি হযরত সাহেবের খেদমতে পেশ করবো। যখন মনের ইচ্ছা পুরো হল আর পাউন্ড আমার কাছে জমা হল, এ কথা বলার পর আবার ভাবাবেগ দেখা দিল। তিনি কাঁদতে লাগলেন। শেষে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বাক্যটি এভাবে পুরো করলেন, যখন পাউন্ড আমার কাছে জমা হ'ল তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইন্তেকাল করেন। আন্তরিকতার কি বিরাট উদাহরণ! এক ব্যক্তি চাঁদা দেন। কুরবানী করেন। মাসে একবার নয় দু'বার নয়। তিন তিন জুমুআ পড়ার জন্য কাদিয়ানে আসেন। সামান্য বেতন সত্ত্বেও সিলসিলার খবরের কাগজ ও বই কেনেন। আজকাল ঐ বেতনের থেকে অনেক বেশি বেতন পাওয়ার লোক আছে। এ কুরবানীর ১০ অংশ কিম্বা ২০ অংশও কুরবানী করে না। তাঁর মনে এ চিন্তা আসে যে, ধনী ব্যক্তিরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে সোনা পেশ করে তাহলে আমি এদের পেছনে কেন থাকবো। সুতরাং তিনি খুব কম টাকা থেকে মাসে কিছু টাকা জমা করেন এবং কিছু সময় পর্যন্ত টাকা জমাতেন। আমার জানা নেই এ সময় তাঁর নিজের ঘরে কি কি কষ্ট তাদের সহ্য করতে হয়েছে। তিনি এত কষ্ট সহ্য করেছিলেন কেবল মাত্র এজন্য যেন তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খেদমতে সোনার মুদ্রা পেশ করতে পারেন। কিন্তু যখন ইচ্ছাপূর্ণ হওয়ার সময় এলো তখন আল্লাহ্‌তাআলার জ্ঞানই তাঁকে এরূপ আনন্দ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করলো, যেভাবে তিনি দেখতে চাচ্ছিলেন (আল্ ফযল, ২৮-৮-১৯৪১)।

হযরত সাহেবের সাথে অকৃত্রিম ভালবাসা ও সম্মানের সম্পর্ক ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর এ সব বন্ধুদের অকৃত্রিমভাবে ভালবাসতেন। নিজের আত্মীয়দের মত তাদের মনে করতেন। লৌকিকতাবিহীন সম্পর্ক ছিল। হযরত জাফর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, একবার আমার এবং মুন্সী অরোড়ে খান সাহেবের এক সাথে কাদিয়ানে আসা হয়। গরমের মৌসুম ছিল। কিছু দিন বৃষ্টি হয় নি। কাদিয়ান থেকে ফেরত আসার সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে সালামের জন্য উপস্থিত হই। মুন্সী অরোড়ে সাহেব হযরত সাহেবের নিকট আবেদন করেন, হুযূর খুব গরম। দোয়া করুন যেন এত বৃষ্টি হয় যাতে নীচেও পানি এবং ওপরেও পানি হয়ে যায়। হযরত সাহেব হেসে বলেন, "আচ্ছা উপরেও পানি এবং নীচেও পানি হবে!" আমি হেসে বলি হুযূর এ দোয়া তাঁর জন্য করুন, আমার জন্য নয়। হযরত সাহেব দোয়া করে বিদায় দেন।

মুন্সী সাহেবের বর্ণনা ঃ এ সময়ে চারদিক সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল। আকাশে বৃষ্টির নাম নিশানা ছিল না। যখন আমরা বাটালার রাস্তায় এক্কাতে বসে কিছু দূরে গেলাম। সামনে একটা মেঘ উঠল। দেখতে দেখতে আকাশ ঢেকে গেল। এতো জোরে বৃষ্টি হল যে, রাস্তার পাশে মাটি ওঠানোর ফলে যে গর্ত হয় তা ভরে গেল। আমাদের এক্কা গর্তের পাশ দিয়ে চলছিল। হঠাৎ এক্কা উলটে গেল। মুন্সী অরোড়ে সাহেব গর্তের দিকে এবং আমি উঁচুর দিকে পড়লাম। যার জন্য মুন্সী সাহেবের ওপর নীচ সব পানি হয়ে গেল এবং আমি পানি থেকে বেঁচে গেলাম। খোদার ফযলে কারও আঘাত লাগে নি। আমি মুন্সী অরোড়ে সাহেবকে উপরে ওঠানোর সময় হেসে বলি, "ওপর আর নীচে পানির দোয়া করিয়ে নাও!" পরে আমরা হযরত সাহেব সম্পর্কে কথা-বার্তা বলতে বলতে রওনা হই (রেওয়ায়াত, মুন্সী জাফর আহমদ; পৃষ্ঠা ৬০-৬১)।

এই ছিল সেই ভালবাসা, আন্তরিকতা, আত্মোৎসর্গ ও প্রেমের বন্ধুত্ব এবং অকৃত্রিম সম্পর্ক যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিজের সাহাবীদের সাথে ছিল।

আনুগত্য ঃ

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, "হুযূর (আঃ) একবার লুধিয়ানায় যাচ্ছিলেন। আমরা করতারপুর থেকে তাঁর সাথে রেলে যাত্রা করলাম। অর্থাৎ মুন্সী অরোড়ে খান সাহেব, মুহাম্মদ খান সাহেব এবং অধম। হুযূর (আঃ) ইন্টার ক্লাসের বগীতে ছিলেন। আমরা ওখানে গিয়ে বসি। কিন্তু আমাদের কাছে তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট ছিল। হুযূর (আঃ) জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের কাছে কোন্ ক্লাসের টিকেট। (এটি কেবল হঠাৎ ও স্বভাবগত বিষয় ছিল যা হুযূর জিজ্ঞেস করেন)। আমরা উত্তর দিই তৃতীয় শ্রেণীর। তিনি বলেন, ইন্টার ক্লাসের ভাড়া আদায় করে দিও। যখন স্টেশনে আমরা ঐ বেশি পয়সা দিলাম, তখন স্টেশন মাষ্টার যিনি আমাদের সাথে পরিচিত, নিতে অস্বীকার করে বলে যে, এতো সাধারণ কথা। মুন্সী অরোড়ে সাহেব বলেন, এ আমাদের মুর্শীদের আদেশ। এতে তার ওপর খুব প্রভাব হলো। আর ঐ টাকাও দেয়া হয়। (রেওয়ায়াত, মুন্সী জাফর আহমদ পৃষ্ঠা ১৩৩)।

শিশুদের সাথে ভালবাসা ঃ

হযরত মুন্সী সাহেব প্রায় কাদিয়ানে আসতেন। তিনি আমার সাথে সাথে হযরত সাহেবকে খবর দিতেন। ছেলে-মেয়েদের ডাকতেন। বিশেষতঃ যখন তিনি কাদিয়ানে আসতেন শিশুদের মধ্যে সাড়া পড়ে যেত যে, মুন্সী সাহেব এসেছেন। তিনি প্রায় সাহেবযাদাদের দিয়ে হুযূরকে খবর পাঠাতেন। একবার তিনি মিয়াঁ বশীর আহমদ সাহেবকে দূত হিসাবে পাঠান। মিয়াঁ সাহেব হযরত সাহেবের হাত ধরে তাঁকে বাইরে নিয়ে আসেন। এতে হযরত সাহেব হেসে বলেন, "মুন্সী জী, আপনার পেয়াদা খুব শক্ত" (আল্ ফযল ১/১১/১৯১৯)।

হযরত মুন্সী অরোড়ে খান সাহেবের মর্যাদা ঃ

পরকালের সঙ্গা লাভের ওয়াদা ঃ

আহমদীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদস (আঃ) ইযালায়ে আওহাম পুস্তকে হযরত মুন্সী অরোড়ে খান সাহেবের আন্তরিকতা, ভালবাসা ও আত্মোৎসর্গের কথা সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করেছেন। হযরত আকদস (আঃ) কপুরথলার বন্ধুবর্গকে পরকালের সঙ্গী হওয়ার যে দাওয়াত দিয়েছেন এর মধ্যে হযরত মুন্সী অরোড়ে খান সাহেবেরও উল্লেখ আছে। হযরত মুন্সী মুহাম্মদ খান সাহেবকে লেখা হযরত আকদস (আঃ)-এর ২৭ জানুয়ারী, ১৮৯৪ তারিখের চিঠি এখানে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

"আপনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সৎ। আমি আপনাকে এবং আপনার সকল একনিষ্ঠ জামাতের সদস্যদের এক আত্মোৎসর্গ ও সৎদল হিসাবে বিশ্বাস করি। আমার আপনার সাথে, মুন্সী অরোড়ে সাহেব এবং কপুরথলার অন্যান্য বন্ধুদের সাথে আন্তরিক ভালবাসা আছে। আমি আশা করি যে, আপনারা এ দুনিয়াতে এবং আখেরাতে খোদাতাআলার ফযল ও কৃপায় আমার সাথে থাকবেন। আপনি ঐ বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা সংখ্যায় খুব কম। আপনি আন্তরিক ভালবাসার সাথে সব কিছু করেছেন। সব সময় সততা দেখান। সুতরাং কীভাবে ভুলে যেতে পারি। অবকাশের সময় আমার সাথে সাক্ষাত করতে থাকুন (বদর, ১-১০-১৯০৮, রেওয়ায়াত, মুন্সী জাফর আহমদ, পৃষ্ঠা ১৪৯)।

তিনি কেবলমাত্র বয়াত করেন নি বরং ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কপুরথলার বন্ধুদের আন্তরিকতার উল্লেখ করে বলেন, "খোদাতাআলার কুদরতের বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়। কপুরথলার মাটিতে খোদাতাআলা সেই প্রভাব রেখেছেন। এখানে যেসব লোক সিলসিলাতে দাখেল হয়েছেন তারা কোন দলিল, কোন মু'জিযা বা কোন নির্দশনের জন্য হন নি। তাদের ঈমান কায়েম রাখার জন্য কোন কাশফ্ বা কারামতের প্রয়োজন হয় নি। বড় বড় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে এবং যত বড় পরীক্ষাই হোক ঐ লোকদের ওপর খোদার এরূপ আশিস আছে যে, তাদের সামান্যতম পদস্খলন হয় নি। এর প্রকৃত কারণ হল, তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মু'জিযাপূর্ণ জীবন দেখে বয়াতই নেয় নি বরং তাঁরা ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। আর এমন উন্নতি করেছেন যে, লাইলী মজনূর প্রেমের অনুরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন (আল্ হাকাম, ৭-১২ মে, ১৯০৯, হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের রেওয়ায়াত, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪)।

কাজ নিজে নিজেই হয়ে যায় ঃ

হযরত মুন্সী অরোড়ে খান সাহেবের বিশ্বাসের স্তর থেকে তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। সে সম্পর্কে উল্লেখ করে বলা হয়, "একটি কথা আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং আমার রূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও এ লেখাটি সম্ভবতঃ সাধারণ লোকদের জন্য লাভজনক প্রতিপন্ন হবে না। তবুও কিছু সমঝদারদের জন্য রুচি সম্মত কথা, যা সাধারণ দলিলের থেকে বেশি উপকারী।

মুন্সী মুহাম্মদ অরোড়ে খান সাহেবের সাথে হযরত আকদস (আঃ)-এর বিশেষ ভালবাসা ছিল। সাধারণতঃ অন্যদের তা মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, একবার হযরত আকদস (আঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, লোকেরা আমাকে দোয়ার জন্য বলে আর আপনি বলেন না, এর কারণ কী? তিনি উত্তর দেন। আমার বলার দরকার হয় না। আমি নিজেই খোদার কাছে চেয়ে নিই। সে সময় আপনার ওপর আল্লাহ্তাআলা যে অনুগ্রহ ও করুণা করেছেন সেদিকে লক্ষ্য রাখি। আর আমার কাজ নিজেই হয়ে যায়। আমার এ থেকে এক তো তাঁর ঈমানের ওপর নজর পড়ে যে, এ কেমন ঈমান। আর আল্লাহ্তাআলার করুণার ওপর কীরূপ ভরসা! দ্বিতীয়তঃ হযরত আকদস (আঃ)-এর সত্যতার ওপর কীরূপ বিশ্বাস! (রেওয়ায়াত, হযরত মুন্সী জাফর আহমদ খান, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫)।

হযরত মুন্সী সাহেবের সব সময় চেষ্টা থাকতো, যদি হযরত সাহেবের সেবা করার কোন সুযোগ হয় তবে তিনি সবার আগেই সম্পাদন করবেন। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব কপুরথলার এসব প্রেমিকদের উল্লেখ করে বলেন, "আমার এ কথা বলা মুস্কিল যে, এসব প্রেমিকদের কার মর্যাদা কী ছিল তা আল্লাহ্তাআলাই ভাল জানেন। আমি হযরত মুন্সী হাবিবুর রহমান সাহেব, হযরত মুন্সী অরোড়ে খান সাহেব, হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবকে খুবই গভীর দৃষ্টিতে দেখেছি। এসব বুযূর্গের এ খাদেম ভাইয়ের প্রতি ভালাবাসা ছিল। আমি এদের মধ্যে যার অবস্থার ওপর লক্ষ্য করেছি তিনিই হযরত মসীহ্ মাওউদের সাথে প্রেম, ভালবাসা, আনুগত্য, একত্মতার বিচারে অতুলনীয় (রেওয়ায়াত, হযরত মুন্সী জাফর আহমদ, পৃষ্ঠা ৪৯)।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ লেখেন, "তিন বুযূর্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত মিয়াঁ মুহাম্মদ খান সাহেব মরহুম, হযরত মুন্সী অরোড়ে খান সাহেব মরহুম, হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব মরহুম। এ তিনজন বুযূর্গ প্রকৃতপক্ষে মসীহ্র প্রদীপে আত্মোৎসর্গকারী পতঙ্গ ছিলেন। তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিলো এ প্রদীপের চারদিকে ঘুরে জীবন উৎসর্গ করা। এরা উচ্চ স্তরের প্রেমিক, উচ্চ স্তরের একনিষ্ঠ, উচ্চ স্তরের বিশ্বস্ত, উচ্চ স্তরের ত্যাগী, নিজেদের প্রেমাস্পদের প্রেমে পুড়ে যাওয়া যাঁদের ধর্ম এবং ভালবাসা ছিলো। আবার ভালবাসা ও ভালবাসতে নিজেদের সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন। এসব লোক কি কোন দিন মরতে পারে? (রেওয়ায়াত, মুন্সী জাফর আহমদ, পৃষ্ঠা ৫৯)। (১৯৯৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের আনসারুল্লাহ্, রাবওয়ার সৌজন্যে)।

ভাষান্তর ঃ কওসার আলী মোল্লা

হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর উপর দুরূদ পড়ার ফযিলত

মহান আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, 'অবশ্য আল্লাহ্ নবীর উপর রহম পাঠান ও তার ফিরিশ্‌তারা নবীর উপর দুরূদ পড়েন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর ওপর দুরূদ পড় এবং তার প্রতি সালাম পাঠাও" (সূরাতুল আহ্‌যাব ঃ ৫৭)।

এখন আমাদের চিন্তা করা উচিত, যেখানে আল্লাহ্ নিজে আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন রসূল করীম (সঃ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করতে, কিন্তু আমরা এতে অনেক অমনোযোগী হয়ে আছি, যদি এর ফযিলত সম্পর্কে চিন্তা করি তা হলে দেখা যাবে কত ব্যাপক এ বিষয়টি!

আসুন, এখন হাদীস খুলে দেখি এ বিষয় সম্পর্কে কী বলছেন রসূলে করীম (সঃ) ঃ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পড়ে আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন" (মুসলিম)।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দুরূদ পড়ে" (তিরমিযী)।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তির নাসিকা ধূলিমণ্ডিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে, অথচ সে আমার উপর দুরূদ পড়ে নি" (তিরমিযী)।

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমরা আমার কবরকে আনন্দোৎসবের স্থানে পরিণত করো না, বরং আমার উপর দুরূদ পড়ো। কারণ তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দুরূদগুলি আমার কাছে পৌঁছে যায়" (আবূ দাউদ)।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আঁ হযরত (সঃ) বলেন ঃ তোমাদের যে কেউ আমার উপর সালাম পড়ে, আল্লাহ্ তখনই আমার রূহ আমাকে ফেরত দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই" (আবূ দাউদ)।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তির সামনে আমার নাম উল্লেখিত হয়েছে, আর সে আমার উপর দুরূদ পড়ে নি সে-ই হচ্ছে কৃপণ" (তিরমিযী)।

উপরের বর্ণিত কুরআন হাদীস পাঠে আমরা বুঝতে পারছি যে, রসূল করীম (সঃ)-এর ওপর দুরূদ পাঠ করা কত জরুরী একটা বিষয়! অনেকে বলতে পারেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কোন্ ধরনের দুরূদ পাঠ করতে শিক্ষা দিয়েছেন? আঁ হযরত (সঃ) যে দুরূদ পাঠ করতে শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো ঃ আবূ মুহাম্মদ কাব ইবনে উজরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে আমাদের নিকট এলেন। আমরা তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার উপর সালাম কীভাবে পড়বো তা তো আমরা জানি। কিন্তু আপনার উপর দুরূদ কীভাবে পড়বো?

তিনি বলেন ঃ বলো, "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া'আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" (হে আল্লাহ্! রহম কর মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর, যেমন তুমি রহম করেছিলে ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারবর্গের উপর, নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসার অধিকারী ও মহা মর্যাদাবাদ। হে আল্লাহ্! বরকত দান কর মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর, যেমন তুমি বরকত দান করেছিলে ইবরাহীমের ও ইবরাহীমের পরিবারবর্গের উপর, নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসার অধিকারী ও মহা মর্যাদাবান (বুখারী ও মুসলিম)।

কীভাবে দুরূদ পাঠ করতে হবে তা-ও রসূল করীম (সঃ) শিখিয়ে দিয়েছেন। কত সহজ আমাদের জন্য। এত সহজ হওয়া সত্ত্বেও যদি আমরা বেশি বেশি দুরূদ পাঠ না করি তাহলে আমাদের জন্য বড়ই পরিতাপের বিষয়! আঁ হযরত (সঃ) বলছেন, 'এক বার দুরূদ পড়লে আল্লাহ্ তার বিনিময়ে দশবার রহমত নাযিল করেন"। তাহলে আল্লাহ্‌তাআলার এই বিশেষ রহমত থেকে কেন আমরা পিছে থাকবো। তাই আসুন আমরা সবাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কথার উপর পূর্ণ আমল করতে চেষ্টা করি এবং সব সময় শান্তি কামনা করি। হে আল্লাহ্! আমাদের সঠিক পথে চলার তৌফীক দাও, আমীন।

- মাহমুদ আহমদ সুমন
মোয়াল্লেম

প্রসঙ্গ - তাক্‌ওয়া (খোদা-ভীতি)

মহান আল্লাহ্‌তাআলার পবিত্র বাণী দ্বারাই আরম্ভ করছি আজকের লেখা। বর্তমান বিন্যাস হিসাবে কুরআন করীমের সর্বপ্রথম আদেশ হলো, **ইয়া আইয়্যুহান্নাসু'বুদূ রব্বাকুমুল্লাযী খলাক্বকুম ওয়াল্লাযীনা মিন্‌কাবলিকুম লআল্লাকুম তাত্তাকূন** অর্থাৎ "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিতে পার" (সূরাতুল বাকারা ঃ ২২)। এই আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশই কুরআনে প্রদত্ত অনুশাসনগুলির মধ্যে প্রথম। এই অনুশাসন কেবল আরবদের জন্য নয়। বরং সারা মানব জাতির উপর ইহা প্রযোজ্য। কেননা, **ইয়া আইয়্যুহান্নাসু** বলে বিশ্ব-মানবের প্রতি এই নির্দেশ পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, ইসলাম প্রথম হতেই বিশ্বধর্ম হবার দাবী করেছে। গোত্রীয় বা ভৌগলিকগত ধর্মের আদেশকে উচ্ছেদ করে ইসলাম প্রারম্ভিক পর্যায়ই বিশ্ব-মানবতার একক ভ্রাতৃত্বকে সমুন্নত করার ধর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ এই আদেশের মধ্যে প্রত্যেক মানবকে ইবাদত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে মানুষ তাক্‌ওয়াশীল, খোদা-ভীরু ও মুত্তাকী হতে পারে। ইবাদতের মূল বিষয় হলো "হুকুকুল্লাহ্" ও "হুকুকুল ইবাদ" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক আদায় করা। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার হক আদায় করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাক্‌ওয়াশীল হওয়া সম্ভব নয়। যেমন, আল্লাহ্‌তাআলা সূরাতুল বাকারার ৩নং আয়াতে বলেন, **যালিকাল কিতাবু লারয়বাফিহী হুদাল্লীল মুত্তাকীন**" অর্থাৎ ইহা সেই কামিল (পূর্ণতম) কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই; যা হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) মুত্তাকীগণের জন্য। এ আয়াতে 'মুত্তাকী' শব্দটি ওয়াকা শব্দ হতে উৎপন্ন যার অর্থ ক্ষতিকর বস্তু হতে রক্ষা পাওয়া। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী উবাই-বিন-কাব তাক্‌ওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুন্দরভাবে বলেছেন, 'মুত্তাকী সেই ব্যক্তি যে কন্টকাকীর্ণ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এমনি

সাবধানে চলে যে, তার কাপড়-চোপড় কাঁটায় যেন জড়িয়ে না যায় বা গুল্মের শাখা-প্রশাখায় লেগে ছিঁড়ে না (কাসীর)। অতএব মুত্তাকী হলেন এমনই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌কে ঢাল, বর্ম বা আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে অতি সাবধানতার সাথে সর্বদা পাপকর্ম হতে আত্মরক্ষা করেন এবং নিজের কর্তব্য সযত্নে পালন করে থাকেন। ধর্মপরায়ণদের জন্য পথ-নির্দেশ শব্দগুলি দ্বারা এটা বুঝায় যে, কুরআনে যে পথ দেখানো হয়েছে তা অনন্ত-অসীম। ইহা মানুষকে সীমাহীন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সাহায্য করে এবং আল্লাহ্‌তাআলার ক্রমবর্ধমান অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য মানুষকে ক্রমাগতভাবে যোগ্য হতে যোগ্যতর করে তুলে। আল্লাহ্‌তাআলা তাক্‌ওয়াশীল বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেন, **ওয়াল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস্‌সলিহাতি উলাইকা আস্‌হাবুল জান্নাতে হুম্ ফিহা খলিদূন** অর্থাৎ এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে (সূরাতুল বাকারা ঃ - ৮৩)।

এই আয়াত তাক্‌ওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, তাক্‌ওয়া ব্যতীত কখনো জান্নাতের অধিবাসী হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যে যত বেশি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছে সে-ই তত বেশি খোদার প্রিয়ভাজন হয়েছে। অপর দিকে তাক্‌ওয়া হতে যারা দূরে রয়েছে তারাই খোদার লানত পেয়েছে। এ নিদর্শন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার প্রমাণিত। খোদাতাআলা অন্যত্র বলেন, "যে মন্দ কর্ম করে তার পাপ তাকে পরিবেষ্টন করে- তারাই আগুনের অধিবাসী তথায় তারা দীর্ঘকাল অবস্থান করবে।" রোযা পালনের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌তাআলা তাক্‌ওয়া অবলম্বনের কথা বলেছেন। যেমন আল্লাহ্ সূরাতুল বাকারার ১৮৪ আয়াতে বলেন, **ইয়াআইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ কুতিবা আলায়কুমুস্ সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন্ কাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকূন** অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হল যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে পার। "ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে রোযা (উপবাস ব্রত) পালন কোন না কোন আকারে সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। অধিকাংশ ধর্মগুলিতে এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কৃষ্টির মধ্যে উপবাসব্রত একটি সাধারণভাবে নির্দেশিত ব্যাপার। আর যেখানে এ ধরনের নির্দেশ নেই, সেখানেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাকিদে অনেকেই উপবাস করে থাকেন" (এনসাই-বৃট)। সাধু পুরুষ ও দিব্য-জ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা হতে জানা যায় যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্ক কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন হতে কতকটা মুক্তিলাভ একান্তই প্রয়োজন। তবে ইসলাম এ উপবাস- ব্রতের মধ্যে নবরূপ নব অর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছে। ইসলাম রোযাকে (উপবাস পালন) পূর্ণ মাত্রার আত্মোৎসর্গস্বরূপ মনে করে থাকে। ইহা আত্মবলিদানের প্রতীক। যিনি রোযা পালন করেন, তিনি যে কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য পানীয় হতেই বিরত থাকেন তেমন নয় বরং সন্তানাদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ হতেও দূরে থাকেন। অতএব যিনি রোযা রাখেন, তিনি তার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেন যে, প্রয়োজনবোধে তার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার খাতিরে তার সবকিছু, এমনকি তার জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে দিতে সামান্যও কুণ্ঠিত নন"।

"হজ্জ পালনের ক্ষেত্রেও তাক্‌ওয়া অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে।" আল্লাহ্‌তাআলা সূরাতুল বাকারার ২০৪ আয়াতে বলেন, "এবং তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর; কিন্তু যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনের মধ্যে (ফিরে যেতে চায়) তা হলে তার কোন পাপ নেই এবং যদি কেউ বিলম্ব করে, তা হলে তার কোন পাপ নেই। ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের সকলকে তার সমীপে একত্র করা হবে"। এই হজ্জের দিনে আরাফাতের লাখো মানুষের সমাগম হাশরের ময়দানের কথা মানসপটে জাগিয়ে তুলে, সকলেরই মনে হয় তারা যেন হঠাৎ মৃত অবস্থা হতে সাদাবস্ত্র খন্ডে আবৃত হয়ে প্রভুর সম্মুখে সম্মিলিত হয়েছেন। কুরবানীর পশুগুলি ইব্‌রাহীম (আঃ) কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে জবাই করার সেই ঐতিহাসিক অনন্য ঘটনার কথা হৃদয়ে পুনর্জাগরিত করে, প্রতীকী ভাষায় যার তাৎপর্য এই যে, মানুষ যেন সর্বদা নিজেকে, নিজের ধন-সম্পদকে এমন কি নিজের সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। এটাই হলো তাক্‌ওয়া। বিবাহের এলানের সময় কুরআন শরীফের যে ৩টি আয়াত পাঠ করা হয় সেখানেও তাক্‌ওয়া অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। সূরাতুন্ নিসার আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় হতে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন কর, এরূপে আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রেও (তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর), নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষণকারী।

এই আয়াত আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠা ও ভয় এবং আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি সম্মান। এ দু'টি কথাকে অতি পাশা-পাশি রেখে আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি উৎকৃষ্ট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। কুরআন আত্মীয়তার বন্ধনকে অতিশয় সম্মান দান করেছে। মহানবী (সঃ) বিবাহ পড়াবার খুৎবা দিবার প্রারম্ভে সাধারণতঃ এ আয়াতটিও পাঠ করতেন। তিনি (সঃ) এ আয়াত পাঠের মাধ্যমে উভয় দলকে তাদের নব আত্মীয়তার উপর পবিত্র বন্ধনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং পরস্পরের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টির উপর জোর দিতেন। আল্লাহ্‌তাআলা পুনরায় বলেন,

"যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, এবং সরল-সুদৃঢ় কথা বল; (সূরাতুল আহযাব ঃ ৭১)।

সর্বশেষ আয়াতটি হলো, "হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করে দেখা উচিত যে, ভবিষ্যতের জন্য সে কি পুণ্য করেছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর উহার সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন" (সূরাতুল হাশর ঃ ১৯)।

সমগ্র মানবমন্ডলীর পাশা-পাশি স্বয়ং মুহাম্মদ (সঃ)-কেও আল্লাহ্‌তাআলা তাক্‌ওয়া অবলম্বনের কথা বলেছেন। যথা- "হে নবী! তুমি আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময় (সূরাতুল আহযাব ঃ ২)।

হযরত নবী করীম (সঃ) হাদীসে বলেন, "সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হলো তাক্‌ওয়া"। তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা মানব জীবনের জন্য খুবই জরুরী। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক নেকীর উৎস হলো তাক্‌ওয়া"। তিনি (আঃ) আরও বলেছেন, খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ 'তাক্‌ওয়া' এমন এক বৃক্ষ যা হৃদয়ে রোপণ করতে হবে। সেই পানি, যদ্বারা তাক্‌ওয়া লালিত-পালিত হয় সমগ্র উদ্যানকে উর্বর করে দেয়। তাক্‌ওয়া এমন এক মূল যে, ইহা না থাকলে সবই বৃথা এবং ইহা বজায় থাকলে সবই বজায় থাকে। ঐ মানুষের বৃথা দাম্ভিকতায় কি লাভ, যে শুধু কথায় খোদা অন্বেষণের দাবী করে, কিন্তু কদমে সিদক্ (সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত) রাখে না। (আল্ ওসীয়্যত)।

মহান আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে সত্যিকার অর্থে তাক্‌ওয়াশীল হওয়ার তৌফীক দান করুন, আমীন।

- মোহাম্মদ আমীর হোসেন
মোয়াল্লেম

সামাজিক জীবনে ইসলাম

ইসলাম বিশ্বের সর্বস্তরের সর্বপ্রকার মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। ইসলাম সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের অতলতলে তলিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে নৈতিকতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামের পূর্বে মানুষ একে অপরকে লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কথা-বার্তায় নানাভাবে প্রভাবিত করত। তারা সামান্য তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক মহারক্তক্ষয়ী সংঘাতের সৃষ্টি করে সহস্র সহস্র মানুষের জীবননাশ করত। দুঃখজনক হলেও সত্য ইহাই যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ইসলামী মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে পুনরায় ইসলাম-পূর্ব যুগের নৈতিকতাবর্জিত কান্ডজ্ঞানহীন জীবনধারাতে ফিরে গিয়েছে। মুসলিম সমাজের ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সমাজপতি হতে শুরু করে কুলি মজুর পর্যন্ত একটি বিশেষ সংখ্যা অসৎ পন্থার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। যার প্রেক্ষিতে বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের মানুষেরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবার পরিবর্তে ঘৃণাভরে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় তারা আজ ইসলামকে নির্মূল করার সর্বপ্রকার কলাকৌশল অবলম্বন করে চলছে। এমতাবস্থায় ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। নিম্নে ইসলামের দৃষ্টিতে কতিপয় দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি ঃ

ব্যবসায়-বাণিজ্য ঃ হাদীস পাঠে জানা যায় যে, হুযূর পাক (সঃ) নিজে ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি দুনিয়ার অন্যান্য কর্মকান্ড অপেক্ষা ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য সত্তর গুণ বেশি দোয়া করেছেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়া অর্থনৈতিক অগ্রগতি অসম্ভব। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টির প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে যেয়ে বলা হয়েছে,

"নামাযান্তে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সন্ধানে রত হবে"- (সূরাতুল জুমুআ ঃ ১১)

এ ব্যবসায় অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে। অবৈধ পন্থায় অর্জিত রিযিক ও ব্যবসায়-বাণিজ্য মুসলমানদের জন্য হারাম করা হয়েছে। সূরা নিসাতে বলা হয়েছে ঃ

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে না কিন্তু তোমরা পরস্পর রাযী হলে তোমাদের জন্য ব্যবসায় করা বৈধ (৩০ আয়াত)। হুযূর (সঃ) বলেছেন, "উত্তম উপার্জন হচ্ছে কল্যাণকর বেচা-কেনা এবং তার স্বীয় হস্তের উপার্জন (তিরমিযী)। একদিন মহানবী (সঃ) মদীনার বাজারে পরিভ্রমণকালে গমের দোকানে গমের বস্তায় হাত ঢুকালেন। এতে তাঁর হাত ভিজে গেল। তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার নহে" (তিরমিযী)। হুযূর (সঃ) বেশি মুনাফার জন্য মালে ভেজাল মিশ্রণ করতে যেমন বারণ করেছেন। ঠিক তেমনি বেশি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মাল কিনে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতেও নিষেধ করেছেন। ইসলামের পূর্বে ব্যবসায়ীরা ওজনে কম দিত। বর্তমানে প্রায় সর্বক্ষেত্রে এ অবস্থা বিরাজিত অথচ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "এবং যখন তোমরা মেপে দাও, মাপ পূর্ণরূপে দাও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লাতে ওজন দাও, পরিণাম হিসাবে ইহাই কল্যাণজনক ও সর্বোত্তম" (বনী ইস্রাঈল ঃ ৩৬)।

সৎ ও আমানতের সাথে যারা ব্যবসায়রত রয়েছেন তাদের জন্য যেমন রয়েছে জাগতিক সম্মান তেমনি রয়েছে পারলৌকিক জগতে খোদার পক্ষ হতে মহাসম্মান। হুযূর (সঃ) বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে পাপী হিসাবে উঠানো হবে। অবশ্য যারা পরহেজগারী, ন্যায়নিষ্ঠা ও সততার সাথে ব্যবসায় করেছে তাদের কথা ভিন্ন (তিরমিযী)। তিনি অপর স্থানে বলেছেন, "সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী হাশরের দিন নবী সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথী হবেন" (তিরমিযী, মিশকাত)। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে- মন্দ পরিণতি তাদের জন্য, যারা ওজনে কম দেয়। যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা তাদের ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়" (সূরা মুতাফফিফীন ঃ ২৪)।

এখন চলমান বিশ্বে ঘুষের আদান প্রদান সম্বন্ধে আলোচনা করছি। ইসলামী পরিভাষায় টাকা-পয়সা বা অন্য কোন বস্তুর বিনিময়ে অবৈধ বিষয়কে বৈধ করণকে ঘুষ বলা হয়। ইসলাম-পূর্ব জগতে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুষ আদান-প্রদান বিদ্যমান ছিল। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার মহাপ্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার চাকাকে সচল রাখার জন্যে ঘুষের আদান-প্রদান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেছেন যে, "ঘুষ গ্রহিতা ও ঘুষ দাতার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হয়" (তিবরানী)। চলমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সমাজ গ্রাম, মহলার নিত্যনৈমিত্তিক বিচারাচার হতে শুরু করে সরকারী বেসরকারী প্রতিটি অফিস আদালতে অবাধে ঘুষের আদান-প্রদান হচ্ছে। কোন কোন দেশের অফিস আদালতে রীতিমত বৈধ কাজ কর্মের জন্যও জনসাধারণকে জিম্মি করে নানা কলা-কৌশলে ঘুষ আদায় করা হয়ে থাকে। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, ঘুষ ব্যতীত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কাজ করে দিতে পারে একথা মানুষ বিশ্বাস করতে নারাজ। যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন অঘুষখোর ন্যায়-নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া যায় তবে মানুষ তাকে মর্তের নয় স্বর্গের বাসিন্দা বলে মনে করে। হ্যাঁ, সত্যই অঘুষখোর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্বর্গের অধিবাসী। কেননা, কোন ঘুষখোর খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না, জগতে খোদার নৈকট্য লাভে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে পরকালে স্বর্গলাভ অসম্ভব। প্রতিটি জনপদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুষের ব্যাপকতার কারণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমানে ধ্বস নেমেছে। এটা হতে নিষ্কৃতি পেতে হলে ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে পরকালের সীমাহীন জগতের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। ভাবতে হবে রিক্ত হস্তে পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণের চিরসত্য বিষয়টি নিয়ে। ঘুষের প্রবাল্যকে রোধ করতে মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর রচিত মুক্তির সনদ হিসাবে পরিগণিত পুস্তক কিশ্‌তিয়ে নূহতে বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ এবং পরকালের দিকে একবারও চক্ষু তুলে দেখতে রাজি নয় সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি ধর্মকে যথার্থই সংসারাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়জ্ঞান করে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার পাপ এবং কু-অভ্যাস যথা-মদ্যপান, জুয়াখেলা, লোলুপদৃষ্টি, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘুষগ্রহণ এবং তদ্রূপ অন্যান্য অন্যায়াচরণ হতে

সম্পূর্ণরূপে বিরত হয় না এবং তওবা করে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে।" দুনিয়ায় আমরা কেউই অমরত্ব নিয়ে আগমন করি নি সবাইকেই মরতে হবে, যেতে হবে খোদার দরবারে। এবং সেথায় অর্জিত সম্পদের পাই পাই হিসাব প্রদান করেই জান্নাতে প্রবেশের সনদপত্র লাভ করতে হবে।

সুদের ব্যবসায় ঃ সুদের আরবী হচ্ছে 'রিবা'। রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মূলধনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাকে রিবা বা সুদ বলা হয়। আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেছেন, 'রিবা'-এর আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। কুরআন মজীদে 'রিবা' বলে ঐ অতিরিক্ত পরিমাণকে বুঝানো হয়েছে, যার মুকাবেলায় কোন বিনিময় নেই (আহকামুল কুরআন, ১ম খন্ড, ৬৬৩ পৃষ্ঠা)।

হুযূর (সঃ) বলেছেন, "যে ঋণ কোন মুনাফাকে টেনে আনে তাই রিবা" (জামেউস্‌সগীর)। অতএব কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে এ শর্তে একশত টাকা প্রদান করে যে, মেয়াদ শেষে গ্রহিতা-দাতাকে একশত বিশ টাকা পরিশোধ করবে তবে বিশ টাকা সুদ হিসাবে গণ্য হবে। জাহেলিয়তের যুগে আরবে এরূপ লেন-দেনের প্রচলন খুব বেশি ছিল। এমনকি গ্রহিতা যদি নির্দিষ্ট মেয়াদে সুদে আসলে, পরিশোধ করতে অক্ষম হতো তবে দাতা সুদের অংশে মুলধনের সাথে মিলিয়ে নুতন করে হিসাব কষতে শুরু করত। এরূপ সুদকে চক্র বৃদ্ধি সুদ বলা হয়। ইসলাম মেয়াদী সুদ ও চক্র বৃদ্ধি সুদ উভয়কে হারাম ঘোষণা করেছে। একই জাতের দ্রব্য ও মুদ্রার লেনদেনের কালে এক পক্ষ চুক্তি মোতাবেক অপর পক্ষকে শরীয়তসম্মত বিনিময় ব্যতীত, যে বর্ধিত মাল প্রদান করে, তাকে মালের সুদ বলা হয়। যেমন এক মন ধানের পরিবর্তে দেড়মন ধান গ্রহণ করা। মালের সুদ হারাম সম্বন্ধে রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন", "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং নিমকের বিনিময়ে নিমক লেনদেন করা হলে তা অবশ্যই সমান সমান ও নগদ হতে হবে। কেউ যদি অতিরিক্ত কিছু প্রদান ও দাবী করে তবে তা সুদে পরিণত হবে। সুদ দাতা ও গ্রহিতা উভয়ই সমান অপরাধী" (মুসলিম)।

সুদ শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। এর ফলে ধন-সম্পদ সমাজের গুটিকয়েক পুঁজিবাদীর কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "হে ঈমানদারগণ। তোমরা সুদ খাওয়া হতে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তবে তোমরা সফলকাম হতে পারবে" (সূরাতু আলে ইমরান ঃ ১৩১)।

আল্লাহ্‌তাআলা সুদের ব্যবসায়ীকে পাগল ও শয়তানের দোস্ত হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। সূরাতুল বাকারার ২৭৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এবং সুদের যা বকেয়া রয়েছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। আর যদি তোমরা উহা না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। হুযূর (সঃ) সুদ দাতা সুদ গ্রহিতা ও সুদের ব্যবসার হিসাব-নিকাশের সাথে যারা জড়িত সবাইকে সমান পাপী বলেছেন (বুখারী)। মিশকাত শরীফের ২৪৬ পৃষ্ঠার একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "সুদের সত্তর প্রকার গুনাহ্ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্নটি হলো স্বীয় মাতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমপর্যায়ের গুনাহ্"।

মদ ও জুয়া ঃ ইসলামে মদারু ও জুয়ারীদের অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। সূরাতুল মায়েদা ৯১-৯২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "হে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি পূজা, বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর, তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা বিরত হবে না।" হুযূর (সঃ) জুয়া সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বলেন, "যদি তার সাথীকে বলে, এসো, জুয়া খেলব, তবে সদকা করা তার উপর অপরিহার্য হয়ে পড়ে" (আল্ হালাল ওয়ালহারদ ফিল ইসলাম, ২৯৫ পৃঃ)।

এ পর্যায়ে ইসলাম বিরোধী এমন একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যাকে হুযূর (সঃ) যাবতীয় অপকর্মের মা বলে চিহ্নিত করেছেন, আর উহা হলো, মিথ্যা কথা বলা। কথাবার্তা ও কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা গুরুতর অপরাধ, কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে অবস্থান কর মিথ্যা কথাবার্তা হতে" (সূরাতুল হাজ্জ ঃ ৩১)।

আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা হতে হলে মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য বর্জন করা অত্যাবশ্যক। কেননা কুরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে ঃ "এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না এবং অসার কার্যকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে" (সূরাতুল ফুরকান ঃ ৭৩)।

এরপর উক্ত সূরার ৭৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'এরাই এমন লোক, যাদেরকে তাদের সৎকর্মের উপর ধৈর্য সহকারে কায়েম থাকার কারণে প্রতিদানস্বরূপ বালাখানা দান করা হবে এবং সেথায় তাদেরকে শুভাশীষ এবং শান্তির বাণী দ্বারা স্বাগতম জানানো হবে"। কোনক্রমেই মিথ্যা বলা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত নয়। এমনকি শিশুদের মনভুলানোর জন্যও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে হবে। অল্প বয়সী একজন সাহাবী বলেছেন, 'একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন। এ সময় রসূলে পাক (সঃ) আমাদের গৃহে অবস্থান করছিলেন। মা আমাকে ডেকে বললেন, এস তোমাকে কিছু দিব। ইহা শুনে হুযূর (সঃ) বললেন, তুমি তাকে কিছু দিতে চেয়েছ? মা বললেন, তাকে খেজুর দিব। তখন হুযূর (সঃ) বললেন, "হ্যাঁ, যদি তুমি তাকে এ সময় কিছু না দিতে তবে এ মিথ্যাটিও তোমার আমল নামাতে লিখা থাকত" (মুসলিম, মিশকাত, ৪২৮ পৃঃ)। মিথ্যাবাদীর পক্ষে জান্নাত লাভ করা অসম্ভব। এ বিষয়ে হুযূর পাক (সঃ) ইরশাদ করেন, "তোমরা মিথ্যা হতে দূরে থাকবে। কারণ মিথ্যা পাপাচার পর্যন্ত পৌছায়। আর পাপাচার জাহান্নামে পৌছায়। কোন ব্যক্তি যখন অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে তখন আল্লাহ্‌র খাতায় তাকে মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয় (বুখারী, মুসলিম)।

মিথ্যা বলা মুনাফেকির শামিল। রসূলে করীম (সঃ) মুনাফিকের মোট তিনটি চিহ্ন উল্লেখ করেছেন। এর একটি হলো, যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে (মুসলিম)। কোন কথা শুনা মাত্রই যাচাই বাছাই না করে বলতে থাকাটাও মিথ্যা বলে পরিগণিত। হুযূর (সঃ) বলেছেন ঃ

"কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই বলে বেড়ায়" (মুসলিম, মিশকাত, ২৮ পৃষ্ঠা)। কোন মিথ্যাবাদী খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। মিথ্যার কারণে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিগতভাবে সম্মানের ক্ষতি সাধিত হয়।

একটি মিথ্যাকে হজম করতে শতাধিক মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। মিথ্যাকে সমাজ হতে দূর করতে হলে প্রথমে নিজের হতে সংগ্রাম শুরু করতে হবে। সবশেষে মদ্যপায়ী পাপাচারীদের সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অভিমত পেশ করে ইতি টানছি। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! এ দুনিয়া চিরকাল অবস্থানের স্থান নয়। তোমরা সাবধান হও, সর্বপ্রকার অনাচার পরিহার কর এবং সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য বর্জন কর। মানুষকে ধ্বংস করতে শুধু মদ্যপানই নহে বরং আফিন, গাঁজা, চরস, ভাঙ, তাড়ি, (ফেনসিডিল, হিরইনও- প্রবন্ধকার) ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের মাদক দ্রব্য, যা সদা ব্যবহারের অভ্যাস করা হয়, মস্তিষ্কের ক্ষতি করে এবং পরিণামে ধ্বংস করে। অতএব তোমরা এসব হতে দূরে থাক। আমি বুঝতে পারি না তোমরা কেন এসব জিনিস ব্যবহার কর যার কুফলে প্রতিবছর তোমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র নেশায় অভ্যস্ত লোক এ দুনিয়া হতে চিরবিদায় নিচ্ছে। তিনি আরো বলেন, হে মুসলমানগণ! তোমাদের নবী (সঃ) তো প্রত্যেক প্রকার মাদকদ্রব্য হতে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিলেন। অতএব তোমরা মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে কার অনুসরণ করছ? কুরআন ইঞ্জিলের ন্যায় মদকে হালাল বলে সাব্যস্ত করে না। সুতরাং তোমরা কোন্ দলিলের সাহায্যে মদকে হালাল সাব্যস্ত করলে? তোমাদের কি মরতে হবে না? [কিশতিয়ে নূহ (আঃ)]। বলা বাহুল্য, বর্তমানে মানুষ দারুণভাবে নিরাপত্তার অভাব উপলব্ধি করছে। নৈতিক মূল্যবোধ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অনৈতিকতার প্রভাবে মুসলিম সমাজ স্বীয় জাতি সত্তা ও ধর্মীয় অনুভূতি যেন খুইয়ে ফেলেছে। মদ, অসৎব্যবসায়, সুদ, ঘুষ মিথ্যা আর মদের মদারু ছাড়াও চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী, অন্যায়, অবিচার-অপরাধ, দুর্নীতি, সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ড সমাজকে সম্পূর্ণরূপে কলুষিত করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় মুসলিম জাতিকে পুনরায় সীরাতে মুহাম্মাদীয়ার উপর প্রতিষ্ঠা করতে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমন হয়েছে। তাই আসুন হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্ কুরআনের বিধান মোতাবেক স্বীয় জীবনকে পরিচালনা করে ইসলামী মূল্যবোধকে সমুন্নত করি।

- মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম

সংবাদ

শুভ বিবাহ

♦জনাব ফজলুর রহমান-এর কন্যা, মোসাম্মাৎ ফজিলাতুর রহমান (মনিকা), ১/৮০১, ইষ্টার্ন হাউজিং এপার্টমেন্ট, ৭৩, গ্রীন রোড, ঢাকা এর সাথে জনাব মরহুম আমান উল্লাহ্ খান এর পুত্র জনাব শওকত আহমদ খান, নাহার ম্যানশন, ৫৩৭ আল্ মাদানী রোড, দক্ষিণ ষোল শহর, চট্টগ্রাম এর বিয়ে ২,০০,০০১/= (দুই লক্ষ এক টাকা) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৫-০৩-০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার, বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামস্থ মসজিদ বায়তুল বাসেত-এ অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্। কেন্দ্রীয় রিশ্তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০২৭৬/০২ তারিখ ১৯/০৫/০২।

♦জনাব হুমায়ুন সরকার এর-কন্যা, মোসাম্মাৎ রানু বেগম সাং ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে জনাব মুহাম্মদ মোঘল মিয়া-এর পুত্র জনাব শামীম আহমদ, সাং উত্তর আহমদী পাড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর বিয়ে ২৪,০০০/= (চব্বিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৬-০৬-০২ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব মৌঃ মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম, কেন্দ্রীয় রিশ্তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০২৭৭/০২ তারিখ ০৭/০৬/০২।

♦জনাব মোঃ আশরাফ আলী-এর কন্যা, মোসাম্মাৎ ফরিদা খাতুন, সাং আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মেরীগাছা-এর সাথে জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম-এর পুত্র জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, সাং আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পুরুলিয়া-এর বিয়ে ২৫,০০০/= (পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৬-০৫-০২ তারিখ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পুরুলিয়াস্থ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব মোঃ ইসহাক আলী, পিতা- মরহুম দেল মাহমুদ। কেন্দ্রীয় রিশ্তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০২৭৮/০২ তারিখ ০৭/০৬/০২।

♦জনাব মীর মোহাম্মদ আলী-এর কন্যা, মোসাম্মাৎ মীর মোবারেকা বানু, সাং ছোট দেওয়ান পাড়া, থানা- সরাইল, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে জনাব মোঃ এনামুল হক-এর পুত্র জনাব মাসুদুল হক সাং ষষ্টিতলাপড়া, হক ভিলা, জেলা যশোর-এর বিয়ে ১,০০,০০৩/= (এক লক্ষ তিন) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৪-০৪-০২ তারিখ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকাস্থ ১২/বি, ২/৩১, মীরপুর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব হাফেয মোঃ সেকান্দর আলী। কেন্দ্রীয় রিশ্তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০২৭৯/০২ তারিখ ১৮/০৬/০২।

♦জনাব মোঃ মুতিউর রহমান-এর কন্যা, মোসাম্মাৎ আঞ্জুমান আক্তার, সাং টেক্স দীঘির পাড়, পোঃ মাহিগঞ্জ, জেলা- রংপুর-এর সাথে জনাব ওয়ারেস মিয়া চৌধুরী-এর পুত্র জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, সাং আহমদাবাদ, পোঃ গৌররং, জেলা- সুনামগঞ্জ-এর বিয়ে ২৫,০০০/= (পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২১-০৬-০২ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। কেন্দ্রীয় রিশ্তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০২৮০/০২ তারিখ ২৩/০৬/০২। এ সব বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যচ্ছে।

- মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রূপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

পাক্ষিক আহমদীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আমাদের অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

New Vo. No. 64 ◆ 24th Issue June 30, 2002 ◆ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com